ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার
হাসান আল শাফী
স্বাগতম চাকমা

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মো. আহ্সান আলী
অধ্যাপক গণেশ সরেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ	:	, ২০১৮

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। জাতিতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদের গৌরব বহন করে। কিন্তু বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মানুষ আমাদের এ গৌরবময় সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে কমই জানে। এ বিষয়টির উপর লক্ষ্যরেখেই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০১২ এর আলোকে প্রথমবারের মতো প্রণয়ন করা হয় **'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি'** বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়বস্তু অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি	১-১৪
দ্বিতীয়	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ	১৫-২৯
তৃতীয়	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন	৩০-৪৪
চতুর্থ	আন্দোলন ও সংগ্রামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৪৫-৫৯
পঞ্চম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান	৬০-৬৯
ষষ্ঠ	জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৭০-৮৪

প্রথম অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম এবং আচার-প্রথা-পদ্ধতি অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ তাদের এই বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব কমই জানে। এমনকি পরস্পরের জানা-শোনার পরিধিও যথেষ্ট নয়। ফলে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা জীবনযাপন পদ্ধতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি আজ হুমকির মুখে। তাদের প্রচলিত ছড়া, রূপকথা, মৌখিক সাহিত্য, সংগীত, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এমনকি খেলাধুলাও হারিয়ে যাওয়ার পথে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয় সম্পর্কে জানব।

চিত্র- ১.১: পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষের দৃশ্য।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংস্কৃতির রূপ বর্ণনা করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছড়া ও রূপকথার স্বতন্ত্ররূপ চিহ্নিত করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গল্প ও লোককাহিনী, লোকগীতি, ছড়া, রূপকথা এবং সংগীতের বিবরণ দিতে পারব;
- বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ দিতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খেলাধুলার বিবরণ দিতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশেষ খেলাধুলার সরঞ্জামাদির তালিকা তৈরি করতে পারব ;
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ এবং তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির দিকসমূহ জানতে আগ্রহী হব ;
- ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংগীতের নান্দনিক দিক উপভোগ করতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ- ০১: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য

আমরা জানি, ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের বাহনই নয়, সেই ভাষা দিয়ে মানুষ তার সৃজনশীল কাজের দৃষ্টান্তও রেখে যায়। আর সাহিত্য হচ্ছে সেই সৃজনশীল কাজের নিদর্শন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেকের যেমন রয়েছে নিজস্ব ভাষা তেমনি রয়েছে সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য। তবে অনেকেরই আবার লিপি না থাকার কারণে সেসব সাহিত্য শুধু মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে দীর্ঘকাল থেকে। মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যের মধ্যে ছড়া যেমন প্রাচীন তেমনি রূপকথাও। এ ছাড়াও লোককাহিনী প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা ঐ জনগোষ্ঠীর প্রাচীন মানুষের মুখে মুখে গল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। একালে আমরা লোকসাহিত্যের নানা লিখিত রূপ পেলেও এক সময় তা ছিল না।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই ছড়া, রূপকথা, লোককাহিনী প্রভৃতি রয়েছে। সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, ওরাঁও, মান্দি, ত্রিপুরা, মৈতৈ, বিষ্ণুপ্রিয়া, পাঙন ও খাসিসহ সবারই নিজস্ব ঐতিহ্য এবং জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্য অর্থাৎ ছড়া, রূপকথা, লোককাহিনী , সংগীত প্রভৃতি রয়েছে। তবে চর্চার অভাবে এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্য তেমন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। এক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় চাকমা ভাষায় রচিত সাহিত্য বিশেষ করে গল্প-কবিতা কিছুটা হলেও চর্চার সুযোগ পেয়েছে। এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সংখ্যায় খুবই কম সেই খুমি, পাংখোয়া, ম্রো, লুসাই, পাত্র, পাহান, মাহালী, মালো, মুন্ডা, ডালুসহ অন্যান্যদের লোকসাহিত্য এতই সমৃদ্ধ যে, এগুলো পাঠ করলে বিস্ময় জাগে। ভাষা ও ঐতিহ্যের বিচারে প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যই গুরুত্বপূর্ণ। লিপি সমস্যা না থাকলে আর জনগোষ্ঠী শিক্ষিত হয়ে উঠলে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র এমনিতেই তৈরি হয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	মানুষের সৃজনশীল কাজের নিদর্শন কী?
কাজ- ২:	রূপকথা ও লোককাহিনী কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল?

পাঠ- ০২: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রূপকথা

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কিছু প্রচলিত ছড়া ও রূপকথা থাকে। যা মূলত তারা দীর্ঘদিন ধরে বংশপরম্পরায় বহন করে থাকেন। এগুলোর মধ্যে তাদের জীবনাচরণের অনেক কিছুরই প্রতিফলন ঘটে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়া,প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত রয়েছে। তবে অনেকের লিখিত সাহিত্য না থাকায় অনেক রূপকথাই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রূপকথাগুলো মূলত তাদের জাতি সৃষ্টির ইতিহাস, পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস , প্রকৃতি গাছ-পালা, চন্দ্র সূর্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে একটি খুমি রূপকথা তুলে দেওয়া হলো-

কচ্ছপের গল্প (ইউকিই আচি): এক বনে এক কচ্ছপ বাস করত। একদিন ঐ বনে একদল বানর গাছে বসে কালোজাম খাচ্ছিল। কচ্ছপটি গাছের নিচে ঝরে পড়া জাম খুঁজছিল। দুষ্টু বানরদল কচ্ছপটিকে দেখে তাকে তুলে গাছের ডালে আটকিয়ে রাখে। এরপর বানরগুলো পালিয়ে যায়। ডালে আটকে থেকে কচ্ছপটি কান্নাকাটি করতে লাগল। তার চোখের জলে গাছের নিচে কাদা হলো। একদিন এক শূকর সেখানে স্নান

করতে এলো। কচ্ছপটি ধুম করে শূকরটির উপর পড়লো। শূকরটি মরে গেল। কচ্ছপটি তখন শূকরটির দাঁত দিয়ে একটি বাঁশি বানাল আর সকাল-সন্ধ্যা সেটি বাজাতে লাগল। বাঁশির সুর শুনে মাটির গর্ত থেকে এক ইঁদুর বেরিয়ে এলো। ইঁদুরটি বাঁশিটি বাজাতে চেয়ে কচ্ছপের কাছ থেকে নিয়ে মাটির গর্তে ঢুকে গেল। মনের দুঃখে কচ্ছপটি কাঁদতে লাগল। তার সে কান্না শুনে গাছের উপর থেকে ডিমে তা দিতে থাকা গোখরা সাপ নিচে নেমে এলো। কচ্ছপ তাকে তার দুঃখের কথা বলল।

সাপটি তখনই কচ্ছপকে তার ডিমে তা দিতে বলে বাঁশি আনতে মাটির গর্তে গেল। কচ্ছপ ডিমে তা দিচ্ছে, তখন দুইটি শ্যামা পাখি এসে নড়ে চড়ে তা দিতে বললে কচ্ছপ তা করল ফলে সাপের ডিম ভেঙে গেল। কচ্ছপ আবার কান্না শুরু করল। সাপটি বাঁশি নিয়ে ফিরে এলে সে তাকে শ্যামা পাখির দুষ্টু বুদ্ধির কথা বলল। সাপটি তাকে বাঁশিটি ফিরিয়ে দিয়ে রাগে-দুঃখে শ্যামা পাখির উপর প্রতিশোধ নিতে নদীর ধারে অপেক্ষায় রইল। একদিন পাখি দুটি নদীতে পানি পান করতে এলে ছোবল মেরে সাপটি প্রতিশোধ নিল।

অনুশীলন	
কাজ-১ ঃ	রূপকথায় কিসের প্রতিফলন ঘটে?
কাজ-২ ঃ	ইউকিই আচি বা কচ্ছপের গল্পের মূলভাব লেখ।

পাঠ- ০৩: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছড়া

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরই নিজস্ব ছড়া রয়েছে। এগুলো খুবই সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যময়। ছড়ার মধ্যে ঘুম পাড়ানি ছড়া প্রায় সব জাতিরই রয়েছে। এখানে বাংলা অর্থসহ মান্দিদের একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া উল্লেখ করা হলো:

মান্দিদের (গারো) আচিক ভাষা	বাংলা ভাষায় অনুবাদ
কুইনি ননো কুইয়ি	ঘুমা খুকী ঘুমা
কাংখি মি সয়েং' আ	কাঁকড়া বসলো রান্নায়
শিরু চি কয়েং আ	শালিক পানি তুলতে যায়
কুইনি ননো কুইয়ি!!	ঘুমা খুকী ঘুমা।
মাম বক্কা চানান্দে	সরু চালের ভাত খাবে
দ-চি বক্কা চানান্দে	তাজা সাদা ডিম পাবে
কুইনি ননো কুইনি!!	ঘুমা খুকী ঘুমা।
জাওয়া বা-ত্র খাতুনোয়া	দস্যি ধরে নিবে যে
মাংখাওয়ী চিকনোয়া	দৈত্য ছিঁড়ে খাবে যে
কুইনি নগে কুইয়ি!!	ঘুমা খুকী ঘুমা।

ত্রিপুরাদের ককবোরক ভাষায় শিশু আদরের একটি ছড়া দেওয়া হলো। আকাশের বুকে যখন চাঁদ উঠে তখন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে বাঁশবনে। তখন ছোট্ট শিশুর গালে আদর সোহাগের চুম্বন একে দিয়ে মা গেয়ে উঠেন–

লামচারি বাই বানাওমানি বাবা কাচাকয়ই
খুতালাই বাই বানাওমানি বাবা কুফুলয়ই
তামা বাথায়নো চাগই ফাইতিহা খোকচি কাচাকয়ই
তামা ববারনো কানই ফাইতিহা ইসোক মুতুময়ই।

বাংলা অর্থ– এখানে শিশুকে দেবপুত্র হিসাবে তুলনা করা হয়েছে। খোকন সোনার দেহখানি যেন সোনার টুকরো, চাঁদের মতো দ্যুতিময়। গাল আর ঠোঁট যেন রক্তরঙ কোনো ফলের আবির মাখা। তার সারা শরীরে যেন কোনো বুনো ফুলের সুবাস ভরা।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	মান্দি ছড়াটি কার উদ্দেশে লেখা হয়েছে? তোমার পঠিত কোনো ছড়ার সঙ্গে কি এর মিল আছে?
কাজ- ২:	ত্রিপুরাদের ছড়াটির সারকথা কী? ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ০৪ঃ চাকমা লোককাহিনী

সাধেং গিরি অচাই একজন বৈদ্য বা কবিরাজ। তার দুই মেয়ে– কসমতি এবং গোমতি। বাবা নিজের বৈদ্য কাজ নিয়ে গ্রাম-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান। দুমেয়ে বাস করে পাহাড়ের জুমে (যেখানে জুম চাষ করা হয়)। তারা অনেক কষ্ট করে সেখানে ফসল ফলায়। অথচ সেখানে থাকার মতো ভালো ঘর নেই। বড় বোন কসমতি তাই আক্ষেপ করে বলে– যে আমাকে জুমঘর বানিয়ে দেবে সে যে-ই হোক আমি তাকে বিয়ে করব। এই কথা যেই না বলা, অমনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো এক বিশাল অজগর সাপ। আর অল্প সময়ের মধ্যেই সে বানিয়ে ফেলল বিশাল এক জুমঘর (চাকমা ভাষায়- গাইরিং)। সেখানে ভাত, তরকারি, আগুন, তামাক, পানি কোনো কিছুরই অভাব নেই। দু'বোন বেশ ভয়ে ভয়ে সে ঘরে ঢুকল। বড় বোন বিয়ে করল সাপকে। এ সাপ যে এক অভিশপ্ত রাজকুমার তা বিয়ের প্রথম রাতেই জানতে পারল কসমতি। অভিশাপের কারণে সে দিনে সাপ আর রাতে মানবদেহ ফিরে পায়।

সুখেই কাটছিল তাদের জীবন। ছোট বোন গোমতি অবশ্য সাপের সঙ্গে এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। একদিন তাদের বাবা এলো জুমঘরে এবং ছোট মেয়ের কাছে সে জানল বড় বোনের বিয়ের গল্প। শুনে তো বাবা রেগে আগুন। বড়বোন ছিল পাশের গ্রামে। দুপুরে সাপরূপী কুমার খেতে এলে বুড়ো বাবা দা দিয়ে এক কোপ দিলে সাপটি দ্বি-খন্ডিত হয়ে

চিত্র- ১.২ : বড়বোন বিয়ে করলো অজগর সাপকে...

২০১৫

মারা গেল। বড় বোন কসমতি ফিরে সেই দৃশ্য দেখে বেদনায়-দুঃখে সাপের মৃতদেহ নিয়ে জঙ্গলে গেল। তারপর সেটি পুঁতে ফেললো টিলার উপর পাথরের নিচে। কদিন পর রক্তলাল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল সে সমাধিস্থল। আর সে টিলা থেকে নামলো দুটি জলের ধারা। একটির নাম লোগাং অন্যটির নাম পুজগাং। এই দুটি পাহাড়ি ছরা বা ছোট জলধারা পার্বত্য পানছড়ি উপজেলা সদরে এখনও রয়েছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	কসমতি কেন সাপটাকে বিয়ে করেছিল?

পাঠ- ০৫: সাঁওতাল লোককাহিনী

এক কৃষকের ঘরে থাকত এক মুরগি আর এক বিড়াল। দুইজনের মধ্যে খুব ভাব। একবার বিড়াল কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেল অন্য জায়গায়। যাওয়ার সময় মুরগিকে বলল, "আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি অন্য কোথাও যাবে না, কেউ দেখা করতে এলেও দেখা করবে না, কথাও বলবে না।"

মুরগি যে একা থাকে দুই দিন পরেই এক শিয়াল তা বুঝতে পারল। কাজেই সে মুরগিকে ধরার জন্য বুদ্ধি খুঁজতে লাগল। শিয়াল রাতে এসে মুরগির ঘরের দরজা নাড়তে লাগল আর ফিসফিস করে ডাকতে শুরু করল। মুরগি রাতের বেলায় তার সঙ্গে কথাও বলল না, দরজাও খুলল না। শিয়াল নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

পরদিন শিয়াল অন্য বুদ্ধি আঁটলো। সে কিছু গম আর খুদ এনে মুরগি যে ঘরে থাকে তার চারদিকে ছিটিয়ে দিল। আর সে সামান্য দূরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। মুরগি খাদ্য খাওয়ার লোভে ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ নেই। কাজেই সে নিশ্চিত মনে খুদ খেতে শুরু করল। শিয়াল এই সুযোগে পিছন থেকে এসে মুরগির গলা কামড়িয়ে ধরল। মুরগি কিছুক্ষণ ছটফট করে মারা গেল।

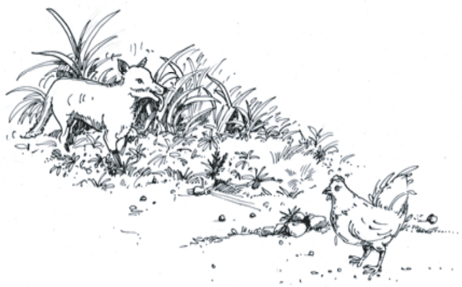
চিত্র- ১.৩ : পরদিন শিয়াল অন্য বুদ্ধি আঁটলো...

পথে শিয়ালের সঙ্গে দেখা হলো সেই বিড়ালের। বিড়াল বুঝতে পারল এটা তারই সেই প্রিয় মুরগি। কাজেই সে শিয়ালের পিছনে পিছনে গেল এবং সে যে গর্তে থাকে তা দেখে এলো। শিয়াল বাচ্চাদের নিয়ে মুরগিটাকে বেশ আমোদ করে খেয়ে ফেলল।

পরদিন শিয়াল তার দুটো বাচ্চাকে গর্তের মধ্যে রেখে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার সময় বাচ্চা দুটোকে বলে গেল, "আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা গর্তের বাইরে যাবে না"। শিয়াল চলে যাওয়ার পর বিড়াল গর্তের কাছে গিয়ে শিয়ালের বাচ্চা দুটোকে ডাকল। কিন্তু বাচ্চারা তার ডাকে কোনো সাড়া দিল না। বিড়াল নিরাশ হয়ে সেদিনের মতো ফিরে গেল।

বিড়াল পরদিন আবার শিয়ালের অনুপস্থিতির সুযোগে তার বাচ্চাদের কাছে গেল। সেদিন সে পায়ে পরল নূপুর, হাতে নিল একটা বড় বস্তা। গর্তের কাছে গিয়ে বিড়াল নূপুর বাজিয়ে নাচতে শুরু করল। নৃত্যের শব্দে শিয়ালের বাচ্চারা আর গর্তের মধ্যে থাকতে পারল না। তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। বিড়াল অল্প

সময়ের মধ্যে শিয়ালের বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। তারপর কৌশলে শিয়ালের বাচ্চাদের বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল এবং বস্তার মুখ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে চলে এলো। কিছু সময় পর গর্তে ফিরে শিয়াল দেখল তার বাচ্চারা নেই। সে তখন বুঝতে পারল নিশ্চয় বিড়ালই তার বাচ্চাদের নিয়ে গেছে। বাচ্চাদের শোকে শিয়াল কাঁদতে লাগল।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	বিড়াল শিয়ালের বাচ্চা দুটোকে কেন ধরে এনেছিল?

পাঠ- ০৬ ও ০৭: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। এগুলো তারা দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় চর্চা করে থাকেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণের প্রধান দিক এটি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রয়েছে ঐতিহ্যময় সংগীত ও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র। এখানে কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও কিছু বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করা হলো-

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত প্রধানত লোকসংগীত। এটি শুধু জনপ্রিয়ই নয়, এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাদের সরল-সাধারণ জীবনের আলেখ্য। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মান্দিদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংগীত হচ্ছে 'রে রে'। এটি তাৎক্ষণিক কথা ও সুরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই দক্ষ 'রে রে' কার অনায়াসে এ গান করতে পারেন।

পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমাদের সংগীত অন্যান্যদের মতোই যথেষ্ট সমৃদ্ধ, বিশেষ করে গ্রাম্য কবিদের রচিত ও পরিবেশিত গান। চাকমা ভাষায় গানকে গীত বলে। যারা এ গান করেন তাদেরকে গেংখুলি বলে। গেংখুলি হচ্ছে চারণকবি বা পালাগানের গায়ক। বিভিন্ন উৎসবে এরা গান করে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের নিজস্ব গান বলতে উভাগীতকে বোঝায়, এর আরেক নাম সাপ্লেগীত। উভাগীত-এর সুরে পুরুষ বাঁশি বাজায় আর নারীরা খেংগ্রং নামক বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি এক প্রকার মাউথ-অর্গান বাজায়। চাকরা নিজেদের ভাষায় বিভিন্ন উৎসব ও শোক-অনুষ্ঠানে গান করে থাকে। গান হচ্ছে- ছিকত্রাং। বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মৈতৈ মণিপুরীদের সংস্কৃতির অন্যতম দিক হচ্ছে গান, নাটক ও নৃত্য। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের প্রাণের সংগীত হচ্ছে কীর্তন। বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মৈতৈ উভয় সম্প্রদায়ই মণ্ডপে বিভিন্ন পর্ব-উৎসবে গান করে থাকে।

ত্রিপুরাদের সংগীত যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সংগীত বলতে তারা মূলত নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে বোঝায়। ত্রিপুরাদের সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতি ও জীবন-জীবিকার সঙ্গে একাকার হওয়া। এক সময়ে ত্রিপুরার রাজ দরবারে ভারতবর্ষের খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞদের স্থান হয়েছিল। রাজা ধনমানিক্যও ছিলেন কীর্তিমান শিল্পী। একটি ত্রিপুরা ভাষায় দেশাত্ববোধক গান বঙ্গানুবাদসহ দেওয়া হলো :

বাংলা আনি আচাইম:নি-হা	বাংলা আমার জন্মভূমি দেশ
বাংলা আনি আচাইম:নি-হা	বাংলা আমার জন্মভূমি দেশ
বাংলা আনি স্বাধীন খাইম:হা	বাংলা আমার স্বাধীন একটি দেশ
বাংলা আনি খ:ফুম:নি	বাংলা আমার প্রাণের প্রিয় দেশ
কচাংফ: কচাংয়া তুংফ: তুংয়া	গরমও নয় ঠান্ডাও নয়, মনের মতো দেশ
তংথাওম:নি হা চামুং কপুংহা	থাকতে যেমন ভালো লাগে
নাই থাওম:নিহা।।	দৃশ্যও তেমনি মনোহরা।।
র:নি হাবা: বাই র:নি নোবা: বাই	শস্য ভরা আমার এই দেশ, এখানেতে আলো বাতাস
বাংলা আমা আংন আ:চাই রৈ মি:	বাংলা মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন
বাংলা হামা:ন কংয়ে মাঁতং ঐ।।	আমি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই নতশিরে।।
আ:রু বাই তাংমুং তৈমুং বাই	এদেশেতে যেমন ঋতু,
বাওহা খাইয়ে মিলি তং ঐ	খাদ্যশস্য তেমন দিত
বাংলা হামা:লে মখানি আরুদৈ	বাংলা আমার মনের রুচির দেশ
চুংম:নি আ:রুদৈ।।	বাংলা আমার মনের মতো দেশ।।

মারমাদের সংগীত ও গীতিনাট্যের ধারা বেশ প্রাচীন। এগুলো বেশ কয়েকটি ধারায় বিভক্ত। যেমন- কাপ্যা, চাগায়াং, সাখ্রাং, লাঙা, লুংদি প্রভৃতি। এখানে সাম্প্রতিক সময়ের একটি মারমা দেশাত্মবোধক গান বাংলা অনুবাদসহ দেওয়া হলো :

তং জইং পাইরো গা হিবারে	পাহাড় আছে চারিদিকে
তং জইং পাই রো গা হি বা রে	পাহাড় আছে চারিদিকে
রে গে খ্যাং কাহ্ রো লখারে	শংখ নদী নেচে গেছে
তং খ্যাং ম্রং ছিহ্ পাইরো হিরে	নদী-নালা-ঝরণা গান করে
রোয়াদম্রোহ্ সায়া হলো বা রে।	সবুজ এই বান্দরবানে।
বাংলাদেশ অক্যোয়াইরো প্রে ফ্রইতে	মোদের দেশ বাংলাদেশ
দে প্রেমা ইখ্যাই নিহ্ গাইতে	সুখে-দুঃখে আছি মিশে
লুগ্রি লুঙে চু: রো পং রো	হাতে হাত রাখি সকলে
দে প্রে গো হলো য়ং লোককাইমে।।	দেশের উন্নতির কাজে।।
ঙাঁকসে আসাইং গা নিং থোয়কতে	পাখির ডাকে সূর্য উঠে
ম্রাক্ পাংতি ঙোয়েরং তক্নিরে	ঘাসগুলো রূপালি সাজে
দে প্রে লু: চইক খইং মারে	রক্ষা করব এ দেশের মান
যাখা মোছে আসাক্কো চোয়েং ন্থইরে।।	যায় যদি যাক প্রাণ।।

ওরাঁওদের বড় উৎসব হচ্ছে কারাম। সে উৎসবে তারা একটি গান করে- ভাই হারানোর গান, বেদনার গান। এখানে সাদরি ভাষার এ গানটি দেওয়া হলো-

খুদিয়াই চুনিয়াই পোষালা ভাইয়ারে
ভাইয়া মোরা গেলেই পরদেশা
একে গোটা পিতারকা ভাইয়ারে
ভাইয়া মোরা গেলেই পরদেশা।
আনাহু পাইব ধানাহু পাইব
পিঠাসানা ভাইয়া কাহা পাইব হো
কানাকা সোনাওয়া পিতারকা ভাইয়ারে
ভাইয়া মোরা গেলেই পরদেশা হো...।

ভাবার্থ: চালের খুদ দিয়ে ভালোবেসে কত কষ্ট করে মানুষ করেছি আমার ভাইটাকে, সে ভাই আজ অন্যদেশে গেল। পিতলের মতো একটাই আমার ভাই। ধান, চাল, টাকা, পয়সা সবই পাবো কিন্তু কানের সোনার মতো মায়ের পেটের যে ভাই দেশ ছেড়ে গেল তারে কোথায় পাই?

বাদ্যযন্ত্র: ওরাঁওরা নাচ-গান-বাজনার প্রতি খুবই আগ্রহী। তাঁদের সমাজের অধিকাংশ পরিবারেই সংগীত পরিবেশন এবং নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সংরক্ষণ লক্ষ করা যায়। এঁরা সাধারণত নিজ হাতে তৈরি করে এসব বাদ্যযন্ত্র এবং এগুলো বৈচিত্র্যময়। এদেশের প্রায় সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ হাতে তৈরি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। ওরাঁও সমাজে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢোল, মাদল, বাঁশি, তাল, নাগারা, খঞ্জনী, ঘুটুর প্রভৃতি। এগুলো সাধারণত এরা বিভিন্ন উৎসবে ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য বছরের অন্যান্য সময়েও ওরাঁওরা নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে তবলা ও হারমোনিয়ামও ব্যবহার করে থাকে।

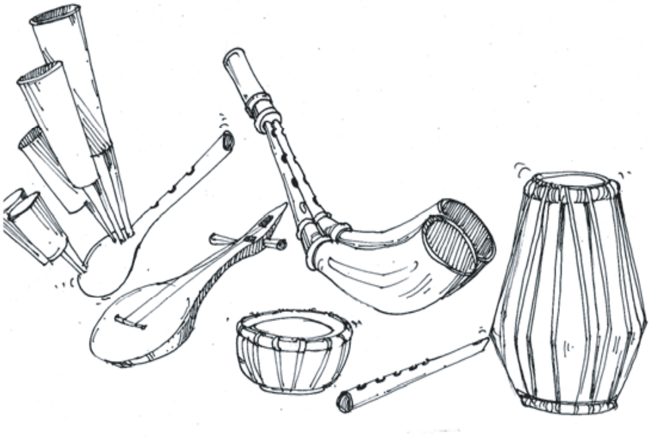

চিত্র-১.৪ : পার্বত্য অঞ্চলের চাকমাদের বাদ্যযন্ত্র।

পাংখোরা বেশকিছু বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। এগুলো তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। সিয়াল রাকি (গয়ালের সিং), ডারসন (পিতলের ঘন্টা), ডারপুই (বড় ঘন্টা), খোয়াং (গাছের কাঠের তৈরি ঢোল), রুয়া খোয়াং (বাঁশের ঢোল) এবং থেই খাং (কৌটার আকৃতি বাঁশের বাদ্যযন্ত্র)। চাকমাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-ধুদুক, হেঙগরঙ, শিঙা, বাঁশি, ডগর, সারিন্দা, তাক প্রভৃতি। রাখাইন-মারমাদের মধ্যে অনেক ধরনের ঢোলের প্রচলন রয়েছে। যেমন– ছেইন-ওয়েইন বা গোলাকার ঢোল, ক্যে-ওয়েইন বা পেটা ঘড়ির আকৃতির ঢোল, পেট-মাহ সবচেয়ে বড় ঢোল প্রভৃতি।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	'রে রে' সংগীত কাদের? এটি কীভাবে করা হয়?
কাজ- ২:	উভাগীত ও খেংগ্রং কী?

পাঠ- ০৮ ও ০৯: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক পরিচ্ছদ

যেকোনো নৃগোষ্ঠীর মানুষেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পোশাক থাকে। বাংলাদেশের সব নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী পোশাক। নানা বর্ণ নানা বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে এসব নৃগোষ্ঠীর পোশাকসমূহ খুবই আকর্ষণীয়। একদিকে যেমন প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন জীবনে এরা সাধারণ পোশাক পরে আবার বিভিন্ন উৎসবে এরা ঐতিহ্যময় পোশাক পরিধান করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা নিজেরাই পোশাক তৈরি করে থাকে। তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণিল পোশাক গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা পার্বত্য জেলায় বেড়াতে গেলে চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা, ত্রিপুরাদের নানা বর্ণের চমৎকার সব নিজেদের তৈরি পোশাক যেমন দেখতে পাবে তেমনি সিলেটে গেলে মণিপুরী ও খাসিদের নানা রঙের এবং নকশাদার পোশাক তোমাকে মুগ্ধ করবে। এখানে কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাকের বর্ণনা ও ছবি দেওয়া হলো।

খেয়াং, খুমি ও চাক পোশাক: খেয়াংদের নিজস্ব পোশাক রয়েছে। তাদের বুননকৃত পোশাক বিশেষ করে মেয়েদের পোশাক দেখতে অনেকটা রাখাইনদের মতো মনে হলেও থামিকে এরা প্যাওন বলে এবং বক্ষবন্ধনীকে লাংগত বলে। খেয়াং পুরুষ নেংটি এবং হাতে সেলাইকরা জামা পরে। বাইরে যাবার সময় তারা মাথায় পাগড়িও পরে।

খুমিরা থামিকে নেনা বলে। এটি নানা রঙে নকশা করা। মহিলারা পাগড়ি পরে, ছেলেরা নেংটি এবং লুঙ্গি। চাকদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে পাংহে কামুহ বা নয়হাতি ধুতি। বর্তমান এটি প্রায় বিলুপ্ত। এর পরিবর্তে লুঙ্গি ব্যবহার করে। ব্লাউজকে এরা বলে 'রাইকাইন পে'।

চিত্র-১.৫ : ত্রিপুরা, খেয়াং, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাকের ছবি

চাকমা ও তঞ্চঙ্গা: হাতে বোনা বা তৈরি ঐতিহ্যময় তাঁত কাপড়ের জন্য চাকমা ও তঞ্চঙ্গারা বিখ্যাত। বেইন নামে কোমর তাঁতের মাধ্যমে নারীরা কাপড় তৈরি করে। চাকমা নারীদের উল্লেখযোগ্য পোশাক হচ্ছে পিনুন, খাদি কানাই, খবং প্রভৃতি।

তঞ্চঙ্গা নারীদের পোশাকের নাম পিনুন । এটি কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রঙিন এবং দৈর্ঘ্য ৪ হাত। দেখতে রংধনুর মতো। চাকমা মহিলাদের পিনুনের মতো তঞ্চঙ্গা পিনুনের দুই প্রান্ত আনুভূমিক ভাবে কালো ও ভেতরের দিকে লাল রঙের মাঝখানে লাল ও হলদে একই মাপের দুই সীমান্ত থাকে। লাল সবুজ, বেগুনি, আকাশি প্রভৃতি রং মিশ্রিত জমিনও থাকে। কিন্তু চাকমাদের পিনুনের মতো উলম্ব (উপর ও নিচে) কোন চাবুগি থাকে না।

সবচেয়ে মজার বিষয় তঞ্চঙ্গাদের কোন গসা বা গোত্র কী পোশাক পরবে তা ঠিক করা আছে। যেমন: কারওয়াসা গসা পিনুন, খাদি, ফারর দুরি, মাথার খবং, সাদা কোবোই সালুম প্রভৃতি। অন্যদিকে মুঅ গসা- পিনুন, খাদি, কালো কোবোই, ব্লাউজ প্রভৃতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ত্রিপুরাদের পোশাকও খুবই আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়। ত্রিপুরা মেয়েরা কোমরে পরার জন্য যে তাঁত কাপড় তৈরি করে তার উপরের অংশের নাম রিসাই এবং নিচের অংশের নাম রিনাই।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মান্দি পুরুষরা গান্দো, পান্ত্রা, জামা, কাদি বা কটিপ এবং মেয়েরা রেকিং, জারন, আনপান, কপিং প্রভৃতি ব্যবহার করে। এক সময়ে হাজং নারীরা নিজেদের তাঁতের তৈরি লাল ও কালো ডোরার পাঁচহাত লম্বা ৩ হাত প্রস্থের যে কাপড় পরত তার নাম পাতিন। এটি এখন প্রায় লুপ্ত।

মারমা পুরুষগণ ধুতির মতো তাঁতে বোনা ‘ধেয়ার’ এবং এর সাথে জ্যাকেটের মতো ‘ব্যারিস্টা আঙ্গি’ জামার উপর পরে। তবে লুঙ্গির প্রচলনও রয়েছে। নারীরা ‘বেদাইত আঙ্গি’ নামের ব্লাউজ পরিধান করে থাকে। এক সময় সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছিল পুরুষের পানচি (ধুতি ছোট করে পরা) এবং নারীদের পানচি-পাড়হান্ড নামের দু খণ্ড মোটা কাপড়। এখন আর এ পোশাক তেমন ব্যবহার হয় না বরং পুরুষ ধুতি ও লুঙ্গি এবং নারীরা শাড়ি পরে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওরাঁওদের পোশাক সাঁওতালদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। খাসি পুরুষরা এক সময় তাদের ঐতিহ্যবাহী কোট, পাগড়ি, ধুতি মোঙ্গল পরিধান করত। অন্যদিকে নারীরা তাদের কাঁধের পাশে যে ঐতিহ্যময় পোশাক পরে তাকে ‘জাংকুবাস' বলে– এটি ঝুলে থাকে।

মণিপুরী নারীদের পোশাকও কম ঐতিহ্যময় নয়। মণিপুরী তাঁতের তৈরি পোশাক খুবই বিখ্যাত। চাকচাবি, ইনাফি, আঙ্গলুরি, চমকির আহিং, ইরুফি, খাংচেৎ প্রভৃতি। আর পুরুষদের পোশাক হচ্ছে- কেইচুম, খুত্তেই কয়েত। মণিপুরীদের পোশাকেও নিজস্ব শিল্প নৈপূণ্যের ছাপ রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমতলে বসবাস করেন তাদের অধিকাংশেরই পোশাক পুরুষদের লুঙ্গি, ধুতি, জামা, পাঞ্জাবি ফতুয়া এবং নারীদের শাড়ি।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	পার্বত্য জেলায় বেড়াতে গেলে কাদের কাদের ঐতিহ্যময় পোশাক দেখতে পাবে?
কাজ- ২:	হাজং নারীদের কোন পোশাকটি এখন প্রায় লুপ্ত?

পাঠ- ১০ ও ১১: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পাহাড়িয়ারা এক সময় বন জঙ্গল নদী-নালার উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে তারা শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করত। ঐ সময় খরগোশ, কুচে এবং শামুক তাদের পছন্দের খাবার ছিল কিন্তু বর্তমানে খুব একটা দেখা যায় না। বর্তমানে ভাত মাছ, ডাল, সবজি প্রভৃতি অন্য সকলের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরও সাধারণ খাবার। চালের গুড়ার তৈরি নানা প্রকার পিঠা ওরাঁওদের ঐতিহ্যময় খাবার। বাঙালিদের পিঠার সঙ্গে এগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে। মুড়ি, মুড়কি নাড়ু মোয়াতো রয়েছেই। কোল, গন্ড, তুরি পাহান, বাগদি, মাহাতো, মাহালী, ভূমিজ, মালো, মুন্ডা, রাজোয়াড়, সাঁওতাল প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর মানুষের খাদ্যাভ্যাস ওরাঁওদের অনুরূপ। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে কেউ হয়তো কোনো কোনো বিশেষ খাবার গ্রহণ করেন না। যেমন তুরিসহ অনেকেই গরুর মাংস খান না। তবে এদের অনেকেই ভাত হতে এক প্রকার পানীয় তৈরি করে যার নাম হাঁড়িয়া। বিভিন্ন উৎসব, পার্বণে ও বিয়ের অনুষ্ঠানে এই হাঁড়িয়া পান করা হয়।

বর্মন, বানাই, হাজং, ডালু এবং কোচসহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের প্রতিদিনের সাধারণ খাবারের তালিকায় রয়েছে ভাত, মাছ, মাংস ইত্যাদি। তবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের রান্নার প্রক্রিয়ায় কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। আবার উৎসব অনুষ্ঠানের খাবারও আলাদা হয়ে থাকে। মান্দিদের অন্যতম খাবার হচ্ছে বিন্নি চালের ভাত মিমিল, গুলথুমমাস্থি, গানথং মাস্থি, মেগারুজওয়া, মেখপ বিৎতা, খিওয়েক খারি, সথুপা, খাপ্পা, মিব্রাম, নাখাম প্রভৃতি।

পাত্ররা ‘পাচুবেন’ নামে একটি প্রিয় খাবার খেয়ে থাকে যা মূলত মাছ ও চাপা শুটকি দিয়ে রান্না করা এক ধরনের স্যুপ। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মণিপুরীদের অধিকাংশই নিরামিষ ভোজী। অনুষ্ঠানাদিতে দই, চিড়া, খই এর প্রচলন রয়েছে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে। খাদ্য তালিকায় শাক, সবজি ও ফল তাদের কাছে পছন্দের। রাখাইনদের প্রিয় খাবার বিন্নিভাত এবং ছোট ছোট চিংড়ি মাছের তৈরি নাপ্পি।

সাঁওতালদের প্রতিদিনের সাধারণ খাবারের তালিকা অনেকটা বাঙালিদের মতোই। তবে ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগি এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে হরিণ, খরগোশ ও কিছু পাখির মাংস খেয়ে থাকে। পাহাড়ের প্রায় সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরই খাদ্যতালিকায় সাধারণ খাবার হচ্ছে ছোট ছোট চিংড়ি মাছের তৈরি নাপ্পি। এছাড়া খেয়াং বা খুমিরা বন্যপ্রাণী শিকার করলে তার মাংস শুকিয়ে রাখে এবং তা পরে খায়। একাধিক পদের সবজি মাছ অথবা মাংসসহ টক-ঝাল মিশিয়ে তৈরি হয় ‘কাইংরাবুং’ যা চাকদের ঐতিহ্যবাহী খাবার। শুঁটকি, সিদ্ধ তরকারি, মরিচবাটা ঐতিহ্যবাহী খাবার। সিদ্ধ তরকারিকে ‘উসুনা চন’ বলে।

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে রান্না করা খাদ্য ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি অতিথিদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। রান্নার পদ্ধতির মধ্যে উচ্যা, সিক্যা, হলা গুদেয়্যা, কেবাং, গরাঙ, কোরবো উল্লেখযোগ্য। কোনো তরকারি সেদ্ধ করে খাওয়াকে উচ্যা বলা হয়। প্রধানত শাক-সবজিই সেদ্ধ করে খাওয়া হয়। সিক্যা হচ্ছে লবণ, হলুদ আর মরিচ মিশিয়ে মাংসখণ্ড আগুনে সেঁকে খাওয়া।

'হলা' হলো কম ঝোল দিয়ে মাছ-মাংস রান্না করা। ধাতব কোনো পাত্রে বা বাঁশের চোঙায় মরিচের পরিমাণ বেশি দিয়ে মিশ্রিত বা চূর্ণ করে প্রস্তুতকৃত কোনো তরকারিকে 'গুদেয়্যা' বলে। কলা পাতা বা অন্যান্য পাতা মুড়িয়ে আগুনে রান্না করা কোনো তরকারিকে 'কেবাং' বলে। পাতা দিয়ে রান্না করা হয় বলে এক বিশেষ সুগন্ধি ও স্বাদ সৃষ্টি হয়। প্রচুর মরিচ আর পেঁয়াজ বা শুঁটকি বা সিদোল মিশিয়ে কোনো শাকসবজি মিশ্রিত করে প্রস্তুত খাদ্য হচ্ছে- 'কোরবো'।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ওরাঁওদের প্রধান প্রধান খাদ্যের নাম লেখ।
কাজ- ২:	পাহাড়ের অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর খাদ্যতালিকায় সাধারণ খাবারের নাম কী? কীভাবে তৈরি হয়?

পাঠ- ১২: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খেলাধুলা

এখানে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু খেলাধুলার পরিচয় পাব। পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একটি সাধারণ খেলা হচ্ছে গিলা খেলা যা চাকমা, মারমা, পাংখোয়া প্রভৃতি জাতির মানুষ খেলে থাকে। খেয়াংদের মধ্যে 'পত্তবলী' বা মন্ত্রযুদ্ধ নামক একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খেলা প্রচলিত। খুমিদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা হচ্ছে 'আথো আচ্ কে'। প্রায় ৫ফুট লম্বা একটি শক্ত বাঁশের দুপ্রান্তে দুই থেকে চার জন মানুষ দাঁড়িয়ে শক্ত করে বগলের নিচে আটকিয়ে একপক্ষ অপর পক্ষকে মাটিতে ফেলার চেষ্টাই হচ্ছে আলো আচ্ কে। যে পক্ষ মাটিতে প্রথমে পড়বে ওরা হারবে। এর আরেক নাম হলো বাঁশ আটকিয়ে শক্তি পরীক্ষা। পাংখোয়াদের উল্লেখযোগ্য খেলাধুলা হচ্ছে-পইকা (ঘিলার খেলা), সাইলেব (কাঠি খেলা), কালচেক বা বাঁশ দিয়ে হাঁটা প্রতিযোগিতা, এছাড়াও বাঁশ ঘোরানো এবং বেতের বৃত্ত বা রিং খেলা উল্লেখযোগ্য।

মারমারা গিলা খেলাকে বলে দো: কজা: বোওয়ে:। এছাড়াও কুস্তি (ক্যাং লুঙ বোওয়ে:), লুকোচুরি (হোঅক্ তাই:) এবং ব্রি: দাই: বা দৌড় তাদের উল্লেখযোগ্য খেলা। লুসাইদের অধিকাংশ খেলাই শক্তি পরীক্ষামূলক খেলা। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইনুসুত নর। এটি ধাক্কা দিয়ে নাড়ানো একটি খেলা, ঢেকিতে যে লাঠি দিয়ে চাল বানানো হয় তা দিয়ে একে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে শক্তিপরীক্ষাই এই খেলার মূল।

মান্দিদের নিজস্ব খেলাধুলার মধ্যে মিসি মেংগং (ইদুর-বিড়াল খেলা), গাং গিসিক্কা (কুস্তি), থুমুয়া (লুকোচুরি), বিনবিন জারি (পা ও আঙ্গুল দিয়ে খেলা), আংখি খেপপা (কাঁকড়া প্যাচের খেলা), চাগ্রিপা (একজনকে ঘেরাও), ওয়াফোং সালা (বাঁশ টানাটানি) প্রভৃতি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বর্মণদের ঐতিহ্যবাহী খেলা হচ্ছে লাঠি খেলা এবং শক্তি পরীক্ষা খেলা। হাজং সমাজের অন্যতম খেলা হচ্ছে-কুক্ কুক্ (খুঁজে বের করা) খেলা, বাঙি পাকা খেলা (পানির মধ্যে বৃত্ত হয়ে ডুব দেওয়া), কাঁকড়া মাও খেলা, নারকোয়াল খেলা (নারকেল ধরার চেষ্টা), পেক খেলা প্রভৃতি।

মৈতৈ মণিপুরীদের সবচেয়ে ঐহিহ্যবাহী খেলা হচ্ছে 'কাংচৈ' যা পরবর্তী কালে 'পোলো' নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা এটি এখান থেকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। এছাড়াও কানামাছি,

বন্দি, কপাটি, অততপানি গুড়গুড়ানি, মাইচং, পাঞ্জা উল্লেখযোগ্য খেলা। খাসিদের খেলার মধ্যে তীর-ধনুক প্রতিযোগিতা, কুস্তি, সাইডিকুট এবং কানামাছি ও হাডুডুও প্রচলিত রয়েছে।

রাখাইন সমাজে লৌকিক খেলাধুলার মধ্যে নিজেদের ভাষায় ‘খ্যেৎ-ক্যাউছি’ (ডাংগুলি জাতীয় খেলা), ক্র-নাঃ-ক্রং লাই-তেংঃ (বিড়াল-ইঁদুর খেলা)’ ইত্যাদি প্রচলিত খেলা। এখানে খেৎ-ক্যাউ-ছি খেলার বিবরণ দেওয়া হলো। এটা অনেকটা ডাং গুলি খেলার মতো। দুটি দলে সম সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। ছেলেরাই এ খেলার খেলোয়াড়। কাঠ বা গাছের ডাল থেকে এ খেলার উপকরণ ডাং ও গুলা তৈরি করা হয়। গুলার যে কোনো প্রান্তকে ডাং দিয়ে মৃদু স্পর্শ করার সাথে সাথেই উড়ন্ত গুলাকে প্রতিজন তিন বার করে খেলে। ডাং এর সাহায্যে দূরত্ব পরিমাপ করে নিজ দলের খেলোয়াড়দের দূরত্ব সমষ্টি করা হয়। যে দলে দূরত্ব বেশি হবে সে দল বিজয়ী হয়। বিজিত দলের খেলোয়াড়দেরকে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়রা কান ধরে বা পিঠে উঠে জয়ের স্বাদ গ্রহণ করে। রাখাইন গ্রামে এ খেলা খুব জনপ্রিয়।

	অনুশীলন
কাজ- ১:	‘আথো আচ্ কে’ কাদের খেলা? এ খেলার বিবরণ দাও।
কাজ- ২:	কোন খেলা ‘পোলো’ নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. ককবোরক কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা?

ক. চাকমা খ. মারমা

গ. গারো ঘ. ত্রিপুরা

২. রূপকথায় প্রতিফলন ঘটে-

i. মানুষের জীবনদর্শন

ii. সমাজের রীতিনীতি

iii. সৃজনশীল সাহিত্যচর্চা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাতানী গ্রামের আনসার গাইন কথায় কথায় জারিগান করেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর তিনি গানে গানে প্রদান করেন।

৩. আনসার গাইনের তাৎক্ষণিক গানের সাথে কোন গানের সম্পর্ক আছে?

ক. গীত খ. রে রে

গ. কীর্তন ঘ. কাপ্যা

৪. আনসার গাইনের গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তার-

i. জীবনের সাধারণ ঘটনাবলি

ii. ধর্মীয় ও সামাজিক দর্শন

iii. শৈল্পিক সৃজনশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. আনিস "রাজা হরিশচন্দ্র" যাত্রাপালাটি দেখছিল। উক্ত রাজা অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ছদ্মবেশী ব্রহ্মা তাকে পরীক্ষা করার জন্য দান হিসাবে রাজ্য চাইলে তিনি তা দেন এবং দক্ষিণা হিসাবে তার স্ত্রী পুত্রকে বিক্রি করে অর্থদান করেন। তিনি নিঃস্ব হয়ে শ্মশানে লাশ পোড়ানোর কাজ নেন। ইতোমধ্যে সাপের কামড়ে তার পুত্রের মৃত্যু হলে লাশ পোড়াতে হরিশচন্দ্রের অবিচলতা দেখে ব্রহ্মা তার রাজ্য, স্ত্রী এবং সন্তান ফেরত দেন।

ক. কসমতি চরিত্র কোন লোককাহিনীর অন্তর্ভুক্ত?

খ. রূপকথায় কিসের প্রতিফলন ঘটে? ব্যাখ্যা কর।

গ. রাজা হরিশচন্দ্র তোমার পাঠ্যপুস্তকের আগরতারার পৌরাণিকের কোন চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রাজা হরিশচন্দ্র যাত্রাপালা এবং আগরতারার পৌরাণিক গল্পটির মূলভাব এক ও অভিন্ন'- বিশ্লেষণ কর।

২. বনফুল স্কুলের তামান্না তার বান্ধবী মিরার গ্রামে বেড়াতে গেল। সেখানে সে ছেলেমেয়েদের সাথে লুকোচুরি খেলল। সে মিরার মাকে পরিবারে কর্তৃত্ব করতে দেখল। দুপুরে তামান্নাকে ভাত ও তেলহীন তরকারি খেতে দেওয়া হলো। সে তা খেতে পারল না।

ক. থেই খাং কিসের তৈরি বাদ্যযন্ত্র?

খ. কাং চৈ খেলা কীভাবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে?

গ. তামান্না যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাড়িতে বেড়াতে গেল তাদের পরিচয় দাও।

ঘ. তামান্নার সংস্কৃতির সাথে মিরার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

সকল সংস্কৃতির নির্দিষ্ট রয়েছে কিছু আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, যা সেই সংস্কৃতির মানুষের আচার-আচরণ ও কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দ্বারাই মানুষ নিজের এবং অন্যের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক বিচার করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করতে চেষ্টা করে। মানব মনের লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ-ক্ষোভ, ভাবাবেগ ইত্যাদি অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার মূল্যবোধ ও আদর্শ। মানুষের সামাজিক জীবনে আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই যে কোনো সংস্কৃতিতেই ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ অধ্যায়ে আমরা সংস্কৃতি ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে জানতে পারব।

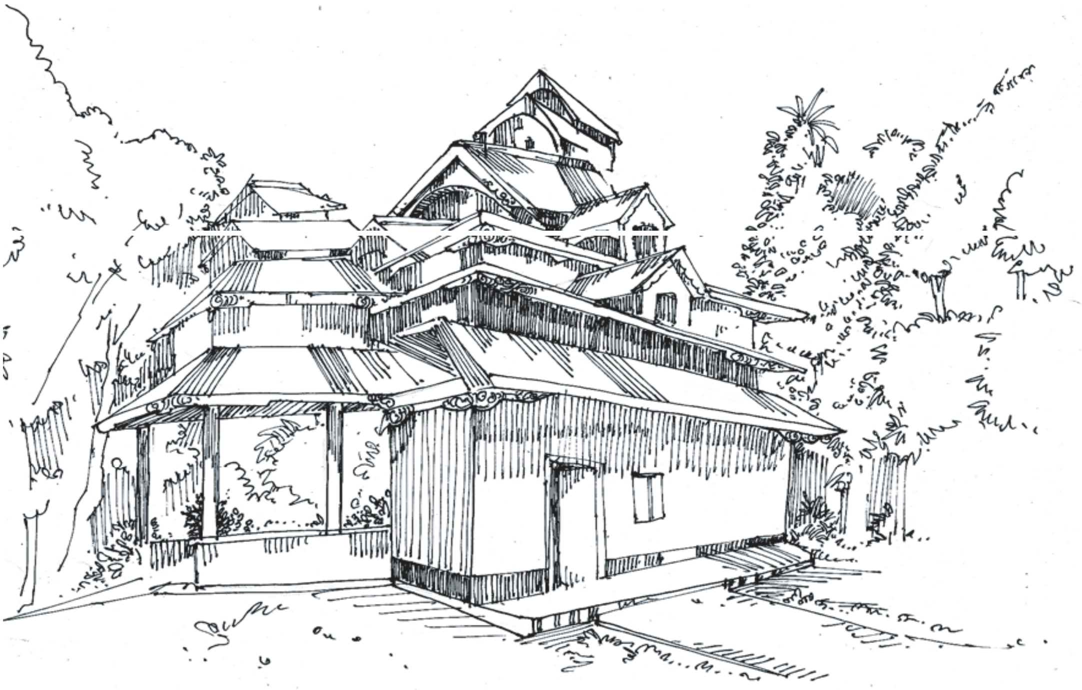

চিত্র-২.১ ঃ চাকমা ও মারমাদের উপাসনালয়

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত আদর্শ বর্ণনা করতে পারব ;
- মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধসমূহ চিহ্নিত করতে পারব ;
- সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ও প্রথাসমূহ বর্ণনা করতে পারব ;
- সমাজে প্রচলিত বিধি নিষেধের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নিষেধাজ্ঞা পালনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

২০১৬

পাঠ- ১: আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা

আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দ্বারাই মানুষ নিজের এবং অন্যের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক বিচার করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করতে চেষ্টা করে। সাধারণভাবে আদর্শ ও মূল্যবোধ ব্যক্তির নিজস্ব বিষয় বলে মনে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে কোনো না কোনোভাবে সংস্কৃতি থেকে পাওয়া। প্রতিটি সংস্কৃতিই তার নিজস্ব মূল্যবোধের ভিত্তিতে সেই সংস্কৃতির সদস্যদের শৈশব থেকে গড়ে তোলে। মানুষ সে অনুযায়ী আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। শৈশবকাল থেকে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের কারণে যে কোনো সংস্কৃতির সদস্যদের কাছে এসব আচরণকে স্বাভাবিক মনে হয়।

আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে আলাদা হয়ে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে বিবাহিত সন্তানেরা বাবা-মায়ের সাথে থাকে; কারণ এসব সংস্কৃতির মূল্যবোধে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে সন্তানেরা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে বসবাস করে। তাই বলা যায় যে, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ এমন কিছু রীতিনীতি, যা বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে বা কী ধরনের আচরণ করবে তা নির্ধারণ করে দেয়। মূলত সামাজিক শৃঙ্খলা বা ভারসাম্য রক্ষার জন্য সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষকে নির্দিষ্ট ধরনের কিছু আচরণ থেকে বিরত রাখে। যেমন, প্রায় সব সংস্কৃতিতেই চুরি করা বা মিথ্যা বলা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে আবার সংস্কৃতি ভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন ইসলামি মূল্যবোধে মুসলিমদের জন্য পশু কোরবানি দেওয়া কর্তব্য, আবার বৌদ্ধদের মাঝে সব ধরনের প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ। সুতরাং, একটি সমাজের মূল্যবোধ দিয়ে অন্য সমাজের মূল্যবোধকে বিচার করা যায় না। তাই মানুষের জীবন-বিধান ও আচরণের বিষয়গুলোকে বুঝতে হলে ঐ সংস্কৃতির আলোকে বুঝতে হবে।

মানুষ নানাভাবে মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে। আমাদের জীবনে মূল্যবোধের প্রাথমিক শিক্ষা হয় পরিবার থেকে। পরিবারের সদস্যরা শিশুকে ভালো-মন্দ বিষয় এবং সঠিক আচরণ সম্পর্কে নানাভাবে শিক্ষাদান করে। বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও মানুষ নানা ধরনের আদর্শ ও মূল্যবোধ শেখে। তবে সব ধর্মের অনুসারীরা কম-বেশি নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধারণ ও লালন করে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	আদর্শ ও মূল্যবোধ কী?
কাজ- ২:	সমাজে মূল্যবোধের ভূমিকা কী?

পাঠ- ২: বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার

সংস্কৃতি ও পরিবেশের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে নৃবিজ্ঞান। সকল ধর্মই তিনটি মূল বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। যথা: (১) ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাস, (২) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও (৩) ধর্ম ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন। তাই ধর্ম সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় এই তিনটি দিক বিবেচনা করা হয়।

ধর্ম হলো এক ধরনের বিশ্বাস, যা নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যে কোনো সংস্কৃতিতেই ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের চারপাশের পরিচিত দৃশ্যমান জগতের বাইরের কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও ভাবধারা গড়ে উঠে। এই অতিপ্রাকৃত শক্তি মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল ঘটনা, যেমন: ভালো-মন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-হতাশা, আনন্দ-বেদনা, রোগ-বালাই ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অধিকারী হলো অতিপ্রাকৃত শক্তি। বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল সংস্কৃতিতেই মনে করা হয় যে, বিভিন্ন প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং উৎসর্গ, বিসর্জন বা বলিদানের মাধ্যমে এই অতি প্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট বা খুশি করা যায়। তাই মানুষ নিজেদের মঙ্গলের জন্য এই অতিপ্রাকৃত শক্তিকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে। ফলে দেখা যায়, ব্যক্তি পর্যায়ে আচার-আচরণ থেকে শুরু করে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রা ও সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

প্রতিটি ধর্মের বর্ণনা সেই ধর্মের অনুসারীদের দিক থেকে যথাযথ ও সঠিক হওয়া প্রয়োজন। কেননা ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টানসহ যে কোনো ধর্ম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সেই ধর্মানুসারীদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আমাদের সকলের সচেতন থাকা উচিৎ। নিরপেক্ষভাবে যে কোনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হলে সেটা অন্যান্য সংস্কৃতি বা ধর্মের মানুষের কাছে অর্থবহ ও সহজে বোধগম্য হয়। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল ধর্মের অনুসারীরাই তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ভাবধারা সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে ধর্ম নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই কেবল সকল মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব।

মানুষের বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠে যে কোনো সংস্কৃতির ধর্মীয় ব্যবস্থা। অনুসারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম হলো খ্রিষ্টান, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও, শিন্টো ইত্যাদি। এসব ধর্মের পাশাপাশি ইহুদি, জৈন, শিখ, বাহাইসহ আরও অনেক ধর্মের অনুসারী পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে আছেন। আবার বর্তমান পৃথিবীর অনেকেই আছেন যারা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করেন না।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	সকল ধর্মের মূল তিনটি বিষয় কী কী?
কাজ- ২:	নৃবিজ্ঞানে কেন এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্ম পাঠ করা হয়?

পাঠ- ০৩: বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বৈচিত্র্য

বাংলাদেশে রয়েছে অনেক নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। ধর্মীয় দিক থেকে এখানে রয়েছে ৮৫% মুসলমান, ১৩% হিন্দু এবং বাকি ২% বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী মানুষ। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী মানুষের মাঝে দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও পাশাপাশি বসবাস বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় দেওয়া হলো :

(১) আদি ও সর্বপ্রাণ ধর্মের অনুসারীঃ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অনেকেই ছিল সর্বপ্রাণ ধর্মের অনুসারী। তবে বর্তমানে এ সকল নৃগোষ্ঠীর অনেক মানুষই ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন। টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের গারো বা মান্দিদের সাংসারেক ধর্ম, সিলেটের মৈতৈদের (মণিপুরী) আপোক্‌পা বা সানামাহি ধর্ম, পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো, খুমি ও বোম এবং উত্তরবঙ্গের ওরাঁও, সাঁওতাল, মুন্ডা ও তুরীদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি সর্বপ্রাণ ধর্মের অন্তর্গত। তবে বর্তমানে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করেছে।

(২) সনাতন ও হিন্দু ধর্মের অনুসারীঃ হিন্দু ধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গের হাজং এবং সিলেটের বিষ্ণুপ্রিয়া (মণিপুরী) নৃগোষ্ঠী। আবার উত্তরবঙ্গের অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজেদের প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসে কিছুটা পরিবর্তন এনে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মে বিলীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ বর্তমানে তারা হিন্দুধর্মের অনুসারী বলে পরিচিত হলেও তাদের কিছু কিছু আদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। এমন কিছু নৃগোষ্ঠী হলো বর্মন, রাজবংশী, কোচ, পাহান, ওরাঁও প্রভৃতি।

(৩) বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গা, খিয়াং, চাক, পাঙ্খোয়া এবং কক্সবাজার ও পটুয়াখালির রাখাইন নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রধানত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। এ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, যেমন, ম্রো ও খুমিদের কেউ কেউ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়ে উঠছে।

(৪) খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বম, লুসাই, ত্রিপুরা, পাঙ্খোয়া, চাকমা, মারমা, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের গারো বা মান্দি, উত্তরবঙ্গের ওরাঁও, সাঁওতাল, মুন্ডা, এবং সিলেটের খাসিদের অনেকেই খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

(৫) ইসলাম ধর্মের অনুসারীঃ বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের অনুসারী একমাত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো সিলেট অঞ্চলের পাঙন (মণিপুরী) নৃগোষ্ঠী। তবে ব্যক্তি পর্যায়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বল্পসংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	বাংলাদেশে কোন কোন ধর্মের অনুসারী রয়েছে?
কাজ- ২:	আদি ও সর্বপ্রাণবাদ ধর্মের অনুসারী কারা?

পাঠ- ০৪ ও ০৫: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে ধর্মের উৎপত্তি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজে ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তোমাদের কিছু সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য ধর্মের উৎপত্তির দুটি ব্যাখ্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করছি। যথা: (১) আত্মার ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি এবং (২) জাদুবিদ্যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি।

(১) আত্মার ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি: খুবই সাধারণ কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাচীন মানুষের জানা ছিল না। এ ধরনের একটি সাধারণ ঘটনা হলো মানুষের ঘুমিয়ে পড়া। ঘুমের মাঝে মানুষ স্বপ্ন দেখে থাকে। আর স্বপ্নে সে অনেকসময় অতীতের কোনো ঘটনা কিংবা মৃত বা অচেনা কোনো ব্যক্তিকে জীবন্ত দেখে থাকে। এই বিষয়গুলো প্রাচীনকালের মানুষকে অনেক ভাবিয়ে তোলে। এছাড়াও,

জীবিত, ঘুমন্ত ও মৃত মানুষের দেহের পার্থক্য কী? আবার ঘুমন্ত মানুষ যেমন জেগে উঠে, তেমনি মৃত মানুষ কেন জেগে উঠে না বা ফিরে আসে না? দিনের বেলা কেন মানুষের ছায়া সব সময় তাকে অনুসরণ করে? এ ধরনের নানা প্রশ্ন নিয়ে মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠে।

আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা আর অনুমানের ভিত্তিতে আদি মানুষেরা এসকল প্রশ্ন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। তারা অনুমান করে যে, মানুষের শরীরের ভিতরে অদৃশ্য কিছু অবস্থান করে। এভাবেই প্রথম প্রাচীন মানুষ আত্মার ধারণা লাভ করে। মানব দেহে আত্মার ধারণা লাভের ফলে মানুষের মৃত্যু, স্বপ্ন দেখা, ঘুমিয়ে পড়ার সময় মানুষের কী হয়, এসব প্রশ্নের জবাব মানুষ খুঁজে পায়। মানুষের দেহে আত্মার অবস্থানের কারণে মানুষ জীবিত থাকে। দেহ থেকে আত্মা চলে গেলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। প্রাচীন মানুষের ধারণা অনুযায়ী, আত্মা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহে ভ্রমণ করতে পারে। আত্মার কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই বলে তারা ধারণা করত যে, শুধু মানুষ থেকে মানুষের দেহেই নয়, বরং যে কোনো প্রাণীর দেহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গাছপালা, এমনকি, প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তুতেও আত্মা অবাধে বিচরণ করতে পারে। অর্থাৎ, আত্মা যে কোনো প্রাণী, গাছপালা কিংবা বস্তুর আকার ধারণ করতে পারে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। আদি মানুষ আরও মনে করত, ঘুমানোর সময় আত্মা জীবিত মানুষের দেহ ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারে এবং সে কারণেই মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় বিভিন্ন ঘটনা দেখতে পায় স্বপ্নের মাধ্যমে। অর্থাৎ, স্বপ্ন হলো ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের আত্মা অন্যত্র চলাফেরা বা বিচরণ করার ফলে দেখা ঘটনা যেগুলো জেগে থাকার সময় দেখা যায় না। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মা একেবারে দেহকে ছেড়ে যায়। তারা আরও বিশ্বাস করতো মানুষের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু বা ধ্বংস হয় না কখনো। তাই মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখা যায়।

আদি মানুষ আরও মনে করত, আত্মার ক্ষমতা সাধারণ জীবিত মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। অলৌকিক বা অতিজাগতিক ক্ষমতার অধিকারী আত্মা মানুষের মঙ্গল কিংবা অমঙ্গলের কারণ হতে পারে বলে মানুষ মনে করত। আত্মা যেমন মানুষের জন্য অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর হতে পারে, তেমনি আত্মা মানুষের উপকারও করতে পারে। মানুষের কাজে আত্মারা যেমন খুশি ও সন্তুষ্ট হতে পারে, তেমনিভাবে বিরক্ত, অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই বিভিন্ন সমাজের মানুষ নানা কাজের মাধ্যমে আত্মাদের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে থাকে। আবার আত্মারা বিরক্ত হতে পারে এমন কাজ এড়িয়ে চলতেও মানুষ সদা সচেষ্ট থাকে। এভাবেই আত্মার ধারণাকেই ধর্মের উৎপত্তির মূল ভিত্তি বলে মনে করেন নৃবিজ্ঞানীরা। আদি থেকে বর্তমানের সকল সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের মাঝেই বিভিন্নভাবে আত্মার ধারণা রয়েছে।

(২) জাদুবিদ্যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি: প্রকৃতির উপর মানুষ সব সময়ই নির্ভরশীল। ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা থেকে শুরু করে বন্য প্রাণীর আক্রমণ কিংবা শীত-গ্রীষ্মকাল প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ সব সময়ই ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। তাই মানুষ সব সময়ই প্রাকৃতিক অবস্থা বা চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শিখেছে। আদি যুগে মানুষের জীবনে নানা রকম অনিশ্চয়তা ও ভীতির পরিমাণও ছিল অনেক বেশি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা থেকে মানুষ নিজেদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা করেছে। নিরাপত্তা বিধান ও বিভিন্ন অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য মানুষ সর্বকালেই প্রকৃতিকে জানার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৃতিকে পরিচালিত করার চেষ্টা

করেছে। মানুষের এই প্রচেষ্টা থেকেই জাদুবিদ্যার উদ্ভব। এভাবে নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা পূরণের জন্য জাদুবিদ্যা ব্যবহৃত হতো বলে মনে করা হয়।

অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জাদুবিদ্যার প্রচলন দেখা যায়। জাদুবিদ্যার দ্বারা মানুষ নানাভাবে বিভিন্ন অনিশ্চয়তা দূর করার এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন ঘটনার ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। যেমন: শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য বাণ মারার প্রচলন বিভিন্ন সংস্কৃতিতে আছে। কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের জন্য তার দেহের কোনো অংশ যেমন, চুল, নখ ইত্যাদিসহ মন্ত্রের ব্যবহার করা জাদুবিদ্যার অন্তর্গত। আবার কাউকে সাপে কামড়ালে ওঝার কথাই সবার আগে মনে হয়। এছাড়া, বিভিন্ন রকম জটিল রোগ-ব্যাধি ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্য অনেকেই ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র, তাবিজ-কবচ ইত্যাদির সাহায্য নেয়। এ সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসক, তান্ত্রিক বা ওঝার আলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে মানুষ।

আদিকালে মানুষ শুধু জাদুবিদ্যা নির্ভর থাকলেও ক্রমশ তারা এর বিভিন্ন দুর্বল দিক আবিষ্কার করে। মানুষ বুঝতে পারে যে, শুধু জাদুবিদ্যা দিয়ে প্রকৃতির সব বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ওঝাদের সীমিত ক্ষমতা ও জাদুবিদ্যার দুর্বলতা থেকে মানুষের মাঝে ক্রমশ অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং দেবতা ও দেবীদের ধারণার সৃষ্টি হয়। ধর্ম ও জাদুবিদ্যা মূলত বিশ্বাস নির্ভর। জাদুবিদ্যা বাস্তবে কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারুক বা না পারুক এর অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, জাদুর মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণ বা পরিস্থিতি পরিবর্তন সম্ভব। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই বিষয়। ধর্মের অনুসারীরা মনে করেন যে, সৃষ্টিকর্তা বা দেবতাদের দ্বারাই বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে প্রাচীনকালের মানব সমাজে জাদুবিদ্যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয় বলে নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মের উৎপত্তি কীভাবে হলো?
কাজ- ২:	বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জাদুবিদ্যার প্রচলন হলো কেন? তোমার ধর্মে কী জাদুবিদ্যার প্রচলন আছে?

পাঠ- ০৬: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় বিশ্বাসে অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা

প্রকৃতির অনেক ঘটনাই মানুষ তার স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না। এছাড়াও রয়েছে মানুষের মৃত্যুভয় এবং বেঁচে থাকা নিয়ে অনেক ধরনের অনিশ্চয়তা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে এ সকল ঘটনা বা জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে নানা ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে।

অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের চেনা জগতের বা পৃথিবীর বাইরের কোনো জগৎ সম্পর্কে ধারণা । এদের অনেকেই বিশ্বাস করে যে, অতি প্রাকৃত শক্তি ঘিরে একটা জগৎ আছে । তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই অতিপ্রাকৃত জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তি দ্বারা। যেহেতু মানুষ বিশ্বাস করে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তা বেশি ক্ষমতাশীল, মানুষ তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আর তাই মানুষ প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উৎসর্গ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। বিশ্বাস করে যে, অতিপ্রাকৃত শক্তির সন্তুষ্টি লাভের সাথে মানুষের ও সমাজের কল্যাণের বিষয়গুলো জড়িত।

বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী চার ধরনের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ও শক্তির কথা জানা যায়। যথা: (১) সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর বা ভগবান; (২) দেবতা ও দেবী; (৩) পূর্বপুরুষ বা অন্যান্য মৃত মানুষের আত্মা; এবং (৪) অতিপ্রাকৃত বা অতিজাগতিক সত্তা ও শক্তি।

(১) সৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বর: ইসলাম ও খ্রিষ্টানসহ আরও কিছু ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ মনে করে সৃষ্টিকর্তা হলেন একক সত্তা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ ধরনের ধর্মকে একেশ্বরবাদী ধর্ম বলা হয়।

(২) দেবতা ও দেবী: অনেক ধর্মে বিভিন্ন দেবতা ও দেবীর ধারণা রয়েছে। এই দেব-দেবীদের অস্তিত্ব, ভাবাবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড অনেকটা মানুষের মতো হলেও এরা হলেন বিশেষ অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ক্ষমতার অধিকারী। কোনো কোনো ধর্মে একাধিক দেবতা ও দেবীর ধারণার উল্লেখ আছে। মনে করা হয় দেব-দেবীদের একেকজন একেক ধরনের আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ধরনের ধর্মকে বহুশ্বরবাদী ধর্ম বলা হয়। পুরাণ বা ধর্মীয় কাহিনীতে দেব-দেবীদের জীবন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে দেব-দেবীর সন্তুষ্টির জন্য নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে।

(৩) পূর্বপুরুষ বা অন্যান্য মৃত ব্যক্তির আত্মা: অন্যান্য ধর্মের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মেও মানুষের মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও বিশ্বাস করে যে মানব দেহ থেকে আত্মা চলে গেলে মানুষের মৃত্যু হয়। মৃতদেহকে পুড়িয়ে ফেলা বা কবর দেওয়া হলেও মৃত ব্যক্তির আত্মা দেখা যায় না। অদৃশ্য আত্মার ক্ষমতা ও বিচরণ নিয়ে রয়েছে মানুষের অনেক ভয়, বিশ্বাস ও কল্পনা। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে অনেক নৃগোষ্ঠীর মানুষই মনে করে, তাদের মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা তাদের কাছাকাছিই থাকে। তাদের পূর্বপুরুষের আত্মা তাদের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকাও রাখতে পারে। তাই তারা মৃত পূর্বপুরুষের আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে ও নানা কিছু উৎসর্গ করে থাকে। অন্যান্য সমাজের মতো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে মনে করা হয় যে আত্মহত্যা, অপঘাত বা দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত মানুষদের ভয় দেখানো বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। এই ধরনের আত্মাকে ভূত, পেত্নি, অশরীরী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়।

(৪) অতিপ্রাকৃত বা অতিজাগতিক সত্তা ও শক্তি : তোমরা বিভিন্ন ভূত-প্রেতের গল্প শুনেছ। এগুলোও এক ধরনের অতিপ্রাকৃত সত্তা। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে বিভিন্ন রকমের অতি প্রাকৃত সত্তা বা শক্তির ধারণা রয়েছে। পরী, দেও, অপদেবতা, রক্ষাকারী দেবতা ও অন্যান্য অতি প্রাকৃত সত্তা মানুষের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বলে অনেক নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করে। আবার অনেকে মনে করে যে অতি প্রাকৃত শক্তিকে খালি চোখে দেখা না গেলেও অনুভব করা যায় এবং এরা মানুষের উপকার বা অনিষ্ট দুইই করার ক্ষমতা রাখে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তি কত ধরনের হতে পারে?
কাজ- ২:	মানুষ কেন ও কীভাবে অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে?

২০১৬

পাঠ- ০৭: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় পুরাণ ও বিশ্বাস

ধর্মীয় দিক থেকে পবিত্র কাহিনীকে পুরাণ বা মিথ বলা হয়। সকল ধর্মের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সনাতনী ধর্মে কীভাবে জগৎ সৃষ্ট হলো, কীভাবে মানুষের জন্ম হলো—কী তার আচার, আচরণ ও সংস্কৃতি এ সংক্রান্ত কাহিনীর বিবরণ আছে। অতিপ্রাকৃত শক্তির ধরন, সৃষ্টিকর্তা ও দেব-দেবীর অলৌকিক ক্ষমতা এবং মহাজগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়বস্তু নিয়ে গড়ে উঠে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় পুরাণ বা মিথ। এসব পৌরাণিক কাহিনী থেকে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায়। ধর্মীয় পুরাণ বা মিথের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজের অনেক রীতি-নীতি, প্রথা ও আইন-কানুন গড়ে উঠে। মানুষের ভালো-মন্দ, জীবন-মৃত্যু, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সমাজের উচুঁ-নিচু জাত ইত্যাদি বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এজন্য পৌরাণিক কাহিনীগুলো মানুষের কাছে সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। এসব কাহিনীকে ঘিরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে পালিত হয় নানারকম আচার-অনুষ্ঠান।

এবার তোমাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী ম্রোদের একটি পৌরাণিক কাহিনী বলব। ম্রো গোষ্ঠীর লোকজন সর্বপ্রাণবাদী ধর্মের অনুসারী। ম্রোরা নিজেদের ম্রোচ্া বলে থাকে। 'ম্রো' অর্থ মানুষ আর 'চ্া' অর্থ দল। ম্রো পুরাণ অনুযায়ী, ভূলোকের সৃষ্টিকর্তা থুরাই একবার পৃথিবীর সব জাতি বা দলকে একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি নির্দিষ্ট সময় তার কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সেই সম্মেলনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যে প্রতিনিধি উপস্থিত হবেন তার হাতে তিনি সেই গোষ্ঠীর ধর্মগ্রন্থ তুলে দেবেন। এছাড়াও তাদের জন্য পালনীয় ধর্মের বিধিনিষেধ এবং রীতি নীতি সেই প্রতিনিধিকে বুঝিয়ে বলবেন। যাহোক, সেই দিনের সেই সম্মেলনে ম্রো প্রতিনিধি যথাসময়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, তাই তাঁর হেঁটে আসতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। তিনি যখন পৌঁছালেন তখন দেখলেন সভাস্থান শূন্য। ইতোমধ্যে, ম্রোদের প্রতিনিধি উপস্থিত না হওয়ায়, সৃষ্টিকর্তা থুরাই একটি গরুকে ম্রো জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের ধর্মগ্রন্থটি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ধর্মগ্রন্থটি ছিল কলাপাতায় লেখা। গরুটি ধর্মগ্রন্থটি নিয়ে ম্রোদের কাছেই আসছিল, কিন্তু পথে তার খুব খিদে পাওয়ায় সে কলাপাতায় লেখা ধর্মগ্রন্থটি খেয়ে ফেলে। এর ফলে থুরাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া, ম্রোদের ধর্মগ্রন্থ তো বটেই, তাদের ভাষার লিখিত রূপ বা বর্ণমালাও হারিয়ে গেল।

এই পুরাণ অনুযায়ী গরুর কারণে ম্রোরা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হারিয়েছে বলে বিশ্বাস করে। আর যেহেতু ঐ হারানো ধর্মগ্রন্থটি লিখিত ছিল তাদের মাতৃভাষায়, তাই বর্তমানে তাদের মাতৃভাষার কোনো লিখিত রূপ বা বর্ণমালা নেই। শুধু তা-ই নয় গরুটি ম্রোদের কাছে এসে বলে যে থুরাই তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু, ম্রোরা পরবর্তীতে সৃষ্টিকর্তা থুরাইয়ের সাথে দেখা হলে সত্য ঘটনা জানতে পারে। সৃষ্টিকর্তা থুরাই মিথ্যা কথা বলার অপরাধে ম্রোদের গরুকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি ও অধিকার দেন। তাই ম্রোদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হলো 'চিয়াসৎপয়'। এই উৎসবে ম্রোরা একটি গরুকে তাদের ধর্মগ্রন্থ খেয়ে ফেলার শাস্তি স্বরূপ সকলে মিলে হত্যা করে। এছাড়াও মিথ্যা বলে তাদের বিভ্রান্ত করার অপরাধে গরুটির জিহ্বা কেটে নেওয়া হয়। ম্রোরা এই গরু হত্যা উৎসবটি করে থুরাইয়ের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময় এই 'চিয়াছত প্লাই' উৎসবে গোহত্যা করা ছাড়াও, অসুস্থতা থেকে আরোগ্যলাভের জন্য বা কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও তারা এই আচার-অনুষ্ঠানটি পালন করে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ধর্মীয় ভাবধারা ও বিশ্বাসের উপাদান কী কী?
কাজ- ২:	মিথ বা ধর্মীয় পুরাণ কাকে বলে?

পাঠ- ০৮: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

ধর্মীয় ভাবধারা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের বিভিন্ন আচরণ, কার্যাবলি বা অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এগুলোকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়ে থাকে। এই আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অত্যাবশ্যক বিষয়। আচার-অনুষ্ঠানগুলো এর অর্থ ও গুরুত্বের দিক থেকে দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যক্রমের চেয়ে আলাদা হয়। অতিপ্রাকৃত শক্তিকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে নিজেদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে এগুলো পালনের মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র আত্মা, শক্তি বা জগতের সাথে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করে।

কোনো কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক ভঙ্গির ব্যবহার করে, পবিত্র বাণী উচ্চারণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বা সামগ্রী ব্যবহার করে। ধর্ম বিশ্বাসীদের জন্য এই কার্যক্রম পালন করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। অতিপ্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য পালিত এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোর পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন, (১) প্রার্থনা, সাধনা ও ভক্তিমূলক, (২) বলিদান, উৎসর্গ বা বিসর্জনমূলক এবং (৩) জাদুবিদ্যামূলক। সংস্কৃতি ও ধর্ম ভেদে এই আচার-অনুষ্ঠানগুলোর দৃশ্যমান রূপ বা উপস্থাপনে পার্থক্য দেখা যায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরে অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যরাও এ ধরনের অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যেমন মৃত ব্যক্তির দেহের সৎকার ও আত্মার কল্যাণের জন্য সব সমাজেই কিছু না কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবধারা অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মা ও তার পরিবারের কল্যাণের জন্য কেউ মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে, আবার কেউবা মৃতদেহকে কবর দেয়। আর মৃতদেহ সৎকারের আগে ও পরে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। আবার বিশেষ কোনো ইচ্ছাপূরণের জন্য, রোগ কিংবা বিপদ মুক্তিতে সাহায্যের আশায় ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। এ সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ধরন এবং পালনের উদ্দেশ্য ও সামাজিক ফলাফল এখানে আলোচনা করা হলো :

২০১৫

আচার-অনুষ্ঠানের ধরন	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্য	আচার-অনুষ্ঠান পালনের সামাজিক ফলাফল
ভাবাবেগ বৃদ্ধির কৃত্য বা আচার-অনুষ্ঠান	(১) প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ; (২) ব্যক্তির নিয়তি বা ভাগ্য নির্ধারণ; (৩) গোষ্ঠী বা সমাজের সকলের নিয়তি বা ভাগ্য নির্ধারণ; (৪) পাপ মোচন অর্থাৎ পাপ কাজের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়া; (৫) ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন ও সাধনার জন্য।	নির্দিষ্ট সমাজের অভ্যন্তরের: (১) বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে; (২) বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের মাঝে সামাজিক সংহতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে উঠে, দৃঢ় হয় এবং বজায় থাকে।
জীবন পর্যায় পরিবর্তনের কৃত্য বা আচার-অনুষ্ঠান	ব্যক্তিজীবনের বা জীবনচক্রের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে সামাজিক মর্যাদা আর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটান। যেমন: (১) একটি শিশুর জন্ম উপলক্ষে পালিত আচার-অনুষ্ঠান; (২) একটি শিশুর নামকরণের আচার-অনুষ্ঠান; (৩) বাচ্চাদের বয়ঃসন্ধির সময় পালিত আচার-অনুষ্ঠান; (৪) বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান; (৫) মৃত্যু ও মৃতদেহ সৎকার নিয়ে পালিত আচার-অনুষ্ঠান।	(১) ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের পরিবর্তন। (২) সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি ও বৈধতা অর্জন। যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি দম্পতি এক সাথে থাকা কিংবা সন্তান জন্মদানের স্বীকৃতি ও বৈধতা অর্জন করে।

নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের বোধ ধরে রাখার জন্য এ সকল নৃগোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদ, মন্দির, চার্চ কিংবা প্যাগোডাতে অথবা সমাজের সবাই একসাথে মিলিত হয়ে নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একাত্বতার চেতনা গড়ে উঠে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষ কেন পালন করে?
কাজ- ২:	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সামাজিক ফলাফল কী কী?

পাঠ- ০৯: পার্বত্য চট্টগ্রামে ম্রো সংস্কৃতিতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান

পূর্ববর্তী পাঠে তোমরা ম্রো-দের ধর্মীয় পুরাণ সম্পর্কে জেনেছ। এবারে তাদের একটি ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে। ম্রো গ্রামগুলোতে ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, কলেরা এসব রোগ প্রায়ই মড়ক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বছর বহু ম্রো এসব রোগে আক্রান্ত হয়। আর আরোগ্য লাভের জন্য তারা ধর্মীয় চিকিৎসা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর বেশি নির্ভর করে। সুস্বাস্থ্য এবং খাদ্য উৎপাদন তাদের জীবনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ম্রো –রা অন্যসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মূলত রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য এবং বেশি ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে পালন করে থাকে। প্রতিবছর জুমচাষের প্রাক্কালে অর্থাৎ জুমের খেতে বীজ বপনের আগে ম্রো গ্রামগুলিতে 'কুয়া খাং' নামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। প্রতিটি ম্রো গ্রামের সকলে মিলে তার দিনক্ষণ নির্ধারণ করে। সাধারণত মার্চ মাসে এই অনুষ্ঠানটি পালিত হয়ে থাকে।

'কুয়া' অর্থ হলো গ্রাম ও 'খাং' অর্থ হলো বন্ধ করে দেওয়া। প্রতিটি ম্রো গ্রাম পৃথক ভাবে 'কুয়া খাং' পালন করে। আর তা পালন করার মধ্যে দিয়ে ম্রো গ্রামটিতে কোনো রোগ বা অশুভ কিছুর প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে তারা বিশ্বাস করে। এই আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমে গ্রামের সীমানা নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়। তারপর গ্রামটিকে বন্ধ ঘোষণা করা হয় যেন সব রোগ ও অমঙ্গল গ্রামের সীমানার বাইরে থাকে। দুই বা তিন দিন ধরে এই 'কুয়া খাং' পালন করা হয়। গ্রামের সবাই আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে এতে অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে বলা হয় 'স্রা' বা 'ওয়াম্মাহ'। সাধারণত ম্রো গ্রামটির প্রধান বা কারবারি 'ওয়াম্মাহ'-র ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও তাঁর দুইজন সহকারী থাকে যাদের বলা হয় 'প্লাইরিয়া'।

গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে 'কুয়া খাং' পালনের জন্য কিছু মুরগি সংগ্রহ করা হয়। একটি ছাগলও জোগাড় করা হয়। এছাড়াও নিয়ম অনুসারে প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে মুরগি প্রদান করতে হয়। যারা সামর্থ্যবান তারা একাধিক ও যার সামর্থ্য কম সে মুরগির বিনিময়ে অন্য কিছু প্রদান করে। 'কুয়া খাং' এর প্রথম দিনে মুরগিগুলোকে বধ করা হয় এবং গ্রামবাসীর জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে ঝর্ণার ধারে ছাগলটিকে বধ করা হয় যেন ছাগলটির রক্ত ঝর্ণার ধারায় মিশে যায়। এই দুই দিন কোনো বহিরাগতকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। গ্রাম থেকেও কেউ বাইরে যেতে পারে না। অর্থাৎ ঐ গ্রামের সাথে বাইরের কারও যোগাযোগ থাকে না। এমনকি গ্রামের কোনো বাড়ির মেয়ের যদি বিয়ের বর অন্য কোনো গ্রামের বাসিন্দা হয়ে থাকে, তাহলে 'কুয়া খাং' আচার পালনের সময় তাকেও গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। গ্রামবাসী ছাড়া অন্য কাউকে এই সময় গ্রামে থাকতে দিলে দুর্ভোগ, দুর্যোগ, রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে বলে তারা মনে করে। আচারটি পালনের শেষে 'ওয়াম্মাহ' ও তার দুই সহকারী বা 'প্লাইরিয়া'কে বিভিন্ন উপহার ও পাগড়ি দিয়ে সম্মানিত করে। বছরে একবার এই আচার পালন করার রীতি থাকলেও কোনো রোগের মড়ক লাগলে বা কারও অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে বছরে অন্য সময়ে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	'কুয়া খাং' কেন পালন করা হয়?
কাজ- ২:	কীভাবে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়?

পাঠ- ১০: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ও মানব জীবনে ধর্মের প্রভাব

বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে অনেক পার্থক্য থাকলেও পৃথিবীব্যাপী সকল ধর্মের রয়েছে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সকল নৃগোষ্ঠীর ধর্মেই অতিপ্রাকৃতের প্রতি এক ধরনের ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে। এই বোধের দ্বারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য ও পবিত্র-অপবিত্রের সীমারেখা টানে, আর সে অনুযায়ী আচরণ করে। কেননা, তাঁরা মনে করে যে, এই নির্দিষ্ট ভালো আচরণের দ্বারাই মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে। অতিপ্রাকৃত শক্তির অনুগ্রহ লাভের আশায় সকল নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন অনুশাসন মেনে চলে। এই ধর্মীয় অনুশাসনগুলোকে বলে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা।

পৃথিবীব্যাপী সকল ধর্মেই অন্য মানুষের প্রতি ভালো আচরণ ও মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত কাজকে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি ভক্তির নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বিরাজমান। সময়ের সাথে সাথে সকল নৃগোষ্ঠীর ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক কিছু বদলে গেলেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনে ধর্মের উপস্থিতি রয়েই গেছে। এ কারণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে ধর্মের কার্যকারিতা ও ভূমিকা বুঝতে পারা জরুরি। ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলো হলো:

(১) সামাজিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কোনো একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা ভালো-মন্দ সংক্রান্ত ধ্যানধারণা গঠন করে এবং সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ধরা যাক, তুমি কারও বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখলে খুব সুন্দর একটি জিনিস, যা তোমার নিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। তুমি যদি কাউকে না জানিয়ে জিনিসটি নিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েও যাও, তবুও তুমি তা নাও না, কারণ তুমি জানো একে বলে চুরি এবং চুরি করা অন্যায় ও পাপ কাজ। একই ভাবে, মিথ্যা বলা, কিংবা কাউকে আঘাত করা এগুলোও তাদের সমাজের চোখে অন্যায় বলেই মানুষ তা করা থেকে বিরত থাকে। এই ন্যায়-অন্যায়ের বোধ তারা প্রধানত তাদের ধর্ম থেকে পায়, আর এই নৈতিকতা বোধই তাদেরকে নানা অপকর্ম ও অনাচার থেকে বিরত রাখে।

(২) জীবন-মৃত্যু ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৌতূহলও চিরন্তর। তারাও কখনো না কখনো ভাবে 'আমি কোথা থেকে এলাম? মানুষই বা কোথা থেকে এলো? মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাবো? বিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো?' তাদের ধর্মও তাদের কোনো না কোনোভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়। জীবন-মৃত্যু, বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্ম মানুষের সাথে প্রকৃতির এবং মানুষে-মানুষে সম্পর্কের দিক-নির্দেশনা দেয়। এভাবে মানুষের জীবন ও বেঁচে থাকাকে অর্থবহ করে তোলে ধর্ম।

(৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের নানা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে একাত্মতা ও সংহতিবোধ তৈরি করে, যার মাধ্যমে তাদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং সমাজ-ব্যবস্থা টিকে থাকে। এ সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আর মূল্যবোধ আরও প্রগাঢ় ও সুদৃঢ় হয়। এভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঐ ধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের মাঝে সামাজিক স্থিতি ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

(৪) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে নানাভাবে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভোগে। এছাড়াও রয়েছে নানাবিধ অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা। এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করে সফলতা লাভের আশায় এ সকল সমাজের

মানুষেরা অতিপ্রাকৃত সত্তার কাছে প্রার্থনা জানায় বা বিভিন্ন আচার পালন করে। অনিশ্চয়তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ধর্ম তাদেরকে সহযোগিতা করে বলে তারা বিশ্বাস করে।

(৫) বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করে যে পবিত্রতা সংক্রান্ত কার্যাবলির মধ্য দিয়ে মোহ ও ভীতি দুই ধরনের অনুভূতিই তৈরি হয়। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের মানসিক মুক্তিও ঘটে। এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী অনুভূতি, যেমন –ভয়, অপরাধবোধ, অনুতাপ, লজ্জা, ক্রোধ এবং উৎকণ্ঠার মুক্তি ঘটে এবং ইতিবাচক অনুভূতি যেমন–আশা, শান্ত, সৌহার্দ ইত্যাদি জন্ম হয়।

(৬) অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ তার চারপাশের জগতের অনেক কিছুকে স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না, ধর্ম তাদেরকে এক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। নানা ধরনের আবেগ, উৎকণ্ঠা (সিদ্ধান্তহীনতা) ও মানসিক চাপ থেকে তারা মুক্তিলাভ করে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে। আবার ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে নানাভাবে অন্যকে সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজে কোনো ইহজাগতিক লাভ না থাকলেও পারলৌকিক পুরস্কার ও পূণ্যের ভাবনা তাদেরকে নানা ধরনের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করে।

ধর্মের কার্যাবলি : পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষকে অন্যদের প্রতি সহনশীল ও মানবিক আচরণের শিক্ষা দিলেও কিছু কিছু অনুসারীর মধ্যে এক ধরনের অনমনীয় মনোভাব দেখা যায়। এরা অন্য মানুষের ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকে। অন্য ধর্ম বা অন্য ধর্মীয় মতবাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিরূপ মনোভাব সমাজে নানা বিপদ ও সংঘাত ডেকে আনতে পারে। এই ধরনের কিছু সমস্যা বাদ দিলে, সাধারণ অর্থে সমাজ ও ব্যক্তির নৈতিকতা ও মানব কল্যাণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মের অনেক কার্যকর ভূমিকা রয়েছে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। ধর্মের নানা ধরনের মনোজাগতিক ও সামাজিক প্রভাব রয়েছে যেমন:

মনোজাগতিক প্রভাব	সামাজিক প্রভাব
○ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজানা বিষয় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদান করে।	○ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আচরণবিধি প্রতিষ্ঠার নৈতিক রূপরেখা প্রদান করে।
○ অজানা ও অস্পষ্ট বিষয়কে ব্যাখ্যা করে ভীতি, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করে।	○ সামাজিক শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে।
○ সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে।	○ সমাজের সংহতি ও সম্প্রীতি ধরে রাখে।
○ অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্য ও সহায়তা লাভের আশা মানুষকে এক ধরনের নিরাপত্তাবোধ দেয়।	○ কোনো সামাজিক দলের সাথে ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় ও সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।
	○ সামাজিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় দাও।
কাজ- ২:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনে ধর্মের মনোজাগতিক ও সামাজিক প্রভাবসমূহ কী?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সমষ্টি হচ্ছে মানুষের-

ক. বিবেক খ. আদর্শ
গ. আচরণ ঘ. কর্ম

২. ধর্মের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. অতিপ্রাকৃত শক্তি ও সত্তায় বিশ্বাস
ii. সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
iii. মানুষের অনিশ্চয়তা দূরীকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সোনারগাঁও উপজেলার লাঙলবন্দে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে স্নান করতে আসে। এ স্নানকে তারা পূণ্যের কাজ মনে করে।

৩. লাঙলবন্দে স্নান করা কী ধরনের অনুষ্ঠান?

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতির খ. ভাবাবেগ বৃদ্ধির
গ. সামাজিক সংহতির ঘ. পারস্পরিক সংহতির

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত আচার পালনের মাধ্যমে-

i. পাপ মোচন হয়
ii. মানুষ পবিত্র হয়
iii. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে উমাচিং মারমার সাথে রূপম চাকমার আলাপ হচ্ছে-

উমাচিং মারমা : মানুষ স্বপ্ন দেখা, ঘুমিয়ে পড়া ইত্যাদি অবস্থায় শরীরের ভিতরে অদৃশ্য কিছুর অবস্থান অনুভব করে।

রূপম চাকমা : শুধু মানুষ কেন, প্রাণীর দেহ থেকে শুরু করে গাছপালার মধ্যেও অদৃশ্য শক্তি বিচরণ করে। এমন চিন্তা থেকে ধর্মের উৎপত্তি ঘটে।

উমাচিং মারমা : সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবন ও জীবিকার অনেক কিছু পরিবর্তন হলেও ধর্মের উপস্থিতি রয়েই যায়।

ক. একেশ্বরবাদ কাকে বলে?

খ. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ থেকে বিরত রাখে- এর মর্মার্থ লেখ।

গ. উমাচিং মারমা এবং রূপম চাকমার বক্তব্যে ধর্মের উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যাটি প্রকাশ পেয়েছে? আলোচনা কর।

ঘ. উমাচিং মারমার সর্বশেষ বক্তব্য ধর্ম সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. সজীব গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে গেল। একদিন সে বাবার সঙ্গে তার গ্রামের অন্য ধর্মের একটি উৎসব দেখতে গেল। সজীব সেখানে দেখল একদল লোক হৈ হুল্লা ও আনন্দ করে একটি পশু হত্যা করছে? সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, এ লোকগুলো কেন পশু হত্যা করছে? বাবা উত্তরে বলল, এটা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে এ উৎসব পালন করে থাকে।

ক. ধর্মীয় দিক থেকে পবিত্র কাহিনীকে কী বলা হয়?

খ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. সজীবের দেখা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় উৎসবের পটভূমি বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় উৎসবের প্রভাব মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন

সমাজ পরিচালনার প্রয়োজনেই গড়ে উঠে মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রতিটি সংস্কৃতিতেই সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ও রীতি-নীতি। ক্ষমতা ও নেতৃত্বের বণ্টনের মধ্য দিয়েই মানব সমাজে রাজনৈতিক-ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হয়। সভ্যতা যত এগিয়েছে তাদের রাজনৈতিক জীবনও ততই বিকশিত হয়েছে। এর চূড়ান্ত রূপ হলো আধুনিক কালের গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও এর পাশাপাশি তাদের রয়েছে নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত আইন বর্ণনা করতে সক্ষম হব ;
- সামাজিক বিচারকার্যের ধরন ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারায় প্রথাগত শাসনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে আগ্রহী হব ;

পাঠ- ০১ এবং ০২: প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহেরও রয়েছে নিজস্ব প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা। সমাজের যিনি প্রধান বা সমাজপতি তিনিই এই প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খিয়াংসহ বিভিন্ন জাতিসত্তার জীবনধারা এখনও তাদের প্রথাগত আইন ও শাসন-ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, যা রাষ্ট্রের আইন দ্বারাও স্বীকৃত। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা যেমন - রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের জন্য রয়েছে তিনটি সার্কেল বা প্রথাগত প্রশাসনিক এলাকা। সেগুলো হলো- চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মং সার্কেল। চাকমা সার্কেলটি রাঙামাটি জেলায়, বোমাং সার্কেল বান্দরবান জেলায় এবং মং সার্কেলটি খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত। প্রতিটি সার্কেলে আছেন একজন সার্কেল প্রধান, যিনি রাজা নামে বেশি পরিচিত। প্রত্যেকটি সার্কেল আবার কয়েকটি মৌজায় এবং প্রতিটি মৌজা কয়েকটি আদাম বা পাড়ায় (বাংলায় গ্রাম) বিভক্ত। প্রত্যেকটি মৌজায় আছেন একজন হেডম্যান, যিনি রাজার সুপারিশ অনুসারে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত হন। হেডম্যান মৌজার প্রজাদের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জুম বা ভূমি কর আদায় এবং সামাজিক বিচার আচার সম্পাদনসহ সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনুরূপভাবে একটি পাড়ার প্রধান হলেন কারবারী। তিনিও তার আদাম বা পাড়ায় সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকেন এবং সমাজের সদস্যদের যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত প্রথাগত আইন অনুসারেই এসব বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। কারবারীর প্রথাগত আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পারলে ঐ ব্যক্তি হেডম্যানের আদালতে এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হলে রাজার কোর্টে আপীল করতে পারেন। অনুরূপভাবে, দেশের সমতল অঞ্চলের মান্দি, খাসি, মণিপুরী, সাঁওতাল, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সমাজেও নিজ নিজ প্রথাগত আইন চালু আছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে মান্দি এবং খাসিদের সমাজ হলো মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal)। মান্দি সমাজের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সামাজিক-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আখিং নকমা (নকমা মানে প্রধান), সংনি নকমা (গ্রাম প্রধান), চ্রা পান্থে (মেয়ে পক্ষের পুরুষ আত্মীয়) প্রভৃতি ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দেশের সাধারণ প্রশাসনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কারণে ধীরে ধীরে মান্দিদের এসব প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কমে এলেও তাদের প্রথাগত নৈতিক আইন এবং অনুশাসন এখনও যথাসম্ভব মেনে চলা হয়। অনুরূপভাবে খাসি জনগোষ্ঠীর সমাজে রয়েছে পুঞ্জীভিত্তিক মন্ত্রী বা হেডম্যান প্রথা, বংশভিত্তিক পরিষদ "সেংকুর", "খাদ্দুহ্" প্রভৃতি ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান। হাজংদের কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি পাড়া এবং কয়েকটি পাড়া নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হয়। পাড়া প্রধানের উপাধি হলো "গাঁও বুড়া" এবং গ্রাম প্রধানকে বলা হয় 'মোড়ল'। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় একটি চাকলা বা জোয়ার এবং কয়েকটি চাকলার সমন্বয়ে গঠিত হয় এক একটি পরগনা। চাকলার প্রধান হলেন 'সড়ে মোড়ল' আর পরগনা প্রধানের উপাধি হলো রাজা। রাজা হলেন হাজংদের সর্বোচ্চ শাসক, রক্ষক ও প্রতিপালক। তবে বাংলাদেশের হাজং সমাজে রাজা প্রথাটি এখন আর প্রচলিত নেই। অন্যদিকে সাঁওতাল সমাজের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থা এখনও বহাল আছে। গ্রামের প্রধানকে বলা হয় মাজহী। যিনি নৈতিকভাবে যাবতীয় বিষয়ের অভিভাবক তার নাম জগমাজহী। এছাড়া আছেন পারানিক (মাজহী সহকারী), নায়কে (পুরোহিত), কুড়ম নায়কে (সহকারী পুরোহিত)

এবং গোডেথ (বার্তাবাহক)। সমাজের যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাদের আছে চার স্তর বিশিষ্ট আদালতের প্রথাগত বিচার-পদ্ধতি। সেগুলো হলো মাজহী, দেশ মাজহী পরগনা এবং ল-বির বা জঙ্গল মহাসভা। বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাকে সাঁওতালরা দিশাম বলে অভিহিত করে থাকেন। আর ল-বির হলো তাদের সর্বোচ্চ আদালত, যা বছরে একবার বসে। এই আদালতে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে সমাজের জটিল সব সমস্যার সমাধান করেন। ল-বির প্রধানকে বলা হয় দিহরি। এভাবে বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা তাদের প্রথাগত আইন, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি এবং অনুশাসন যুগ যুগ ধরে এবং বংশ পরম্পরায় পালন করে আসছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত শাসন কাঠামোর বিবরণ দাও।
কাজ- ২:	বাংলাদেশের হাজং এবং সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন কাঠামো সম্পর্কে যা জানো লেখ।

পাঠ- ০৩ : প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থাটি আসলে কী এবং কেন প্রয়োজন সেটি ভালোভাবে জানার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের বেশ আগ্রহ আছে। প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য দেশের সাধারণ শাসন ব্যবস্থার সাথে এর পার্থক্যকে আমাদের বুঝতে হবে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশে একটি সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এ শাসন ব্যবস্থায় রয়েছে একটি সংবিধান, সরকার। এ সরকার পরিচালনার জন্য রয়েছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এভাবে একটি রাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন ইউনিটের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কল্যাণের জন্য পরিচালিত যাবতীয় কার্যক্রমই হচ্ছে দেশের সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা হলো একটি সীমিত আকারের শাসন-ব্যবস্থা। কারণ, এই ব্যবস্থাটি বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীকে ঘিরে পরিচালিত হয়, যা দেশের সাধারণ জনগণের জন্য প্রযোজ্য নয়। সাধারণত পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে এসব প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা চালু আছে। ইতঃপূর্বে আমরা জেনেছি যে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো ঐতিহাসিকভাবে বরাবরই রাষ্ট্রের সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার বাইরে ছিল। তাদের বসতি অঞ্চলগুলো প্রধানত দুর্গম এবং পাহাড়-পর্বত ও বনাঞ্চলের মাঝে অবস্থিত হওয়ায় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন বা নজরদারির বাইরে থেকে গিয়েছিল। এভাবে স্মরণাতীত কাল থেকে তারা নিজেদের রাজা বা গোষ্ঠী প্রধানের নেতৃত্ব মেনে আলাদা কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং স্বতন্ত্র জীবনধারা নিয়ে প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। দেশের সাধারণ প্রশাসন বা শাসন-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে বংশ পরম্পরায় তাদের সমাজে গড়ে উঠেছিল বিশেষ কিছু প্রথা, রীতি নীতি, অনুশাসন এবং মূল্যবোধ যেগুলো নিজ সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল। নিজেদের মধ্যে যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তারা গ্রাম, মৌজা, গোষ্ঠী প্রধান বা রাজার দেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিত। এভাবে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক, গোত্রগত শৃঙ্খলা এবং শাসন সুসংহত রাখতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য বিশেষ কিছু নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি ও প্রথা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এসব রীতি-নীতি এবং নিয়ম কানুনই প্রথাগত আইন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ

করে। আর প্রথাগত এসব আইন কানুনের দ্বারা যখন সমাজ শাসিত হয় তখন তাকে প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। এসব প্রথাগত আইনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের সাধারণ শাসন-ব্যবস্থায় এবং সংবিধানে এসব প্রথাগত আইন ও রীতি নীতির প্রয়োগ বা স্বীকৃতি না থাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত শাসনের গুরুত্বও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতা বজায় রাখার স্বার্থে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও প্রথাগত শাসন পদ্ধতিগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

পাঠ- ০৪: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামো

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে অঞ্চল ও নৃগোষ্ঠীভেদে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন - দেশের প্রায় ৪৫ টি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে মান্দি এবং খাসি জনগোষ্ঠী হলো মাতৃসূত্রীয় এবং বাকি সবাই পিতৃসূত্রীয়। স্বভাবতই মাতৃসূত্রীয় সমাজ কাঠামোর সাথে পিতৃসূত্রীয় সমাজ কাঠামোর বেশ পার্থক্য রয়ে গেছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দেশের সমতল অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যেও রয়েছে বেশ কিছু পার্থক্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ পিতৃসূত্রীয়। তারা সবাই চাকমা, বোমাং এবং মং এই তিনটি সার্কেলের মধ্যে কোনো না কোনো একটির বাসিন্দা। সার্কেল প্রধান হলেন রাজা এবং রাজার আদালতই প্রথাগত আইন ও শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আদালত। রাজা তার সার্কেলের আওতাভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার কার্য ও বিরোধ নিজ নিজ নৃগোষ্ঠীতে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সমাধা করে থাকেন। এর পরের স্তরে আছেন হেডম্যান বা মৌজা প্রধান। তিনি তার মৌজার বাসিন্দাদের সামাজিক বিরোধ ও বিচার কাজ নিস্পত্তি এবং সরকার নির্ধারিত হারে ভূমি ও জুমের খাজনা আদায় করেন। হেডম্যানের বিচার কাজে সন্তুষ্ট না হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রাজার আদালতে আপিল করতে পারেন। এর পরে রয়েছেন গ্রাম প্রধান বা কারবারী। তিনিও একইভাবে তার গ্রামের বাসিন্দাদের সামাজিক বিরোধ নিস্পত্তি করেন এবং গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় এক একটি গ্রাম (চাকমা ভাষায় যার নাম আদাম বা পাড়া)। পিতা হলেন পরিবারের কর্তা। পরিবারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিতার ভূমিকাই মুখ্য। অন্যদিকে মান্দি ও খাসি সমাজ মাতৃসূত্রীয় হওয়ায় পরিবারে মাতা এবং মামার ভূমিকাই প্রধান, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

বর্তমানে সমাজপতি হিসাবে রাজার অস্তিত্ব না থাকলেও প্রাচীনকালে মান্দি সমাজে রাজপ্রথা বা রাজার শাসন চালু ছিল। সময়ের পরিক্রমার সাথে মান্দিদের প্রথাগত নেতৃত্বে ও ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এক সময় আখিং নকমা (আখিং প্রধান), সংনি নকমা (গ্রাম প্রধান), দ্রা পান্থে (মেয়ের পক্ষের পুরুষ আত্মীয়বর্গ) প্রভৃতি প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের বেশ গুরুত্ব ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আগে সমাজের যাবতীয় বিরোধ এবং অপরাধের বিচার নিস্পত্তি হতো। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলে সমাজের সদস্যরা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং দেশের সাধারণ প্রশাসন ও আইন আদালতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে মণিপুরী সমাজে ঐতিহ্যবাহী প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও টিকে আছে। পাড়া বা গ্রাম হচ্ছে মণিপুরী সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। প্রত্যেক গ্রামে রয়েছে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিযুক্ত হন। সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন বিরোধ এবং অপরাধের বিচার গ্রাম পঞ্চায়েত নিষ্পত্তি করে থাকে। মণিপুরীদের সব গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পরগনা পঞ্চায়েত। জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই পরগনা পঞ্চায়েতের সদস্য পদ লাভ করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে যেসব বিরোধ বা সমস্যার নিষ্পত্তি হয় না সেসব জটিল এবং অমীমাংসিত সমস্যাগুলো পরগনা পঞ্চায়েতে নিষ্পত্তি করা হয়। সিংলুপ নামে মণিপুরীদের আরেকটি প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই সিংলুপের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই সিংলুপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে তাদের নিজস্ব প্রথাগত নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা কাঠামো রয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাদে অন্য প্রায় সকল নৃগোষ্ঠীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের প্রথাগত নেতৃত্ব মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রাম সমাজকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে তাদের বিভিন্ন প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামো। এর পাশাপাশি বর্তমানে দেশে প্রচলিত সাধারণ প্রশাসনের গুরুত্বও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ সমাজের অগ্রসর এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই এখন দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে জনপ্রতিনিধি কিংবা সামরিক বেসামরিক আমলা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রথাগত নেতৃত্ব এবং দেশের সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাও কোথাও কোথাও লক্ষ করা যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত নেতৃত্ব এবং সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামোর সহাবস্থান এখানে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা কাঠামোর (রাজা-হেডম্যান-কারবারী) পাশাপাশি রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং দেশের সাধারণ জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। এই পরিষদের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন মূলত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে আসা রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় পরিষদসমূহের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম এবং অন্যান্য বিষয়, তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন; ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্বসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত রীতিনীতি, সামাজিক বিচার-আচার, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এনজিও কার্যক্রম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকান্ড- প্রভৃতির তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন করা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অনেক নেতা কর্মী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাদের কেউ কেউ সংসদ সদস্য, জেলা পরিষদ কিংবা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে

থাকেন। প্রথাগত নেতৃত্ব ও শাসন কাঠামোর বাইরে জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অংশগ্রহণ কিংবা ভূমিকাও দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রেক্ষাপট এবং এর কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা কর।
কাজ- ২:	একজন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যের পদবি কি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোর অংশ?

পাঠ- ০৫: প্রথাগত আইন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব প্রথাগত আইন রয়েছে। নৃগোষ্ঠী ভেদে প্রথাগত আইনগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও দেখা যায়। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইন প্রায় ক্ষেত্রে অভিন্ন হলেও সমতল অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইনের সাথে সেগুলোর যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। এখানে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতল অঞ্চলের কিছু কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত আইন সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথাগত আইন : প্রথাগত আইন হলো জনগণের জীবনধারা এবং জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা থেকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে উঠা চিরকালীন রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। এসব চিরকালীন রীতি-নীতি বা নিয়মের মূলে আছে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সমষ্টিগত জ্ঞান এবং কোন সমস্যায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে স্মরণাতীত কাল থেকে সমাজে চালু থাকা দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ। সাধারণত জনগোষ্ঠীর প্রধানগণ, তাদের পারিষদবর্গ, তাদের সন্তান এবং এই সন্তানদেরও পরবর্তী সন্তানেরা এসব দৃষ্টান্ত ও নিয়মকানুন বংশ পরম্পরায় নিজেদের স্মৃতিতে লালন করে চলেন। যুগের পর যুগ ধরে বয়ে নিয়ে আসার ফলে এসব দৃষ্টান্ত বা রীতি-নীতির কিছু কিছু হয়তো তাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। আর অবশিষ্ট যা থাকে সেগুলো চিরকালের নিয়ম বা বিধানে পরিণত হয়। এভাবে জনগোষ্ঠীর মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত চিরকালীন নিয়ম বা বিধানই হলো প্রথাগত আইন।

তবে প্রথাগত আইন হতে হলে তাকে অনেক প্রাচীন আমলের হতে হবে কিংবা গোষ্ঠী প্রধানকে সেগুলো পরিচালিত করতে হবে এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। একটি প্রথাগত আইন সমসাময়িক কালেরও হতে পারে এবং জনগোষ্ঠীর সাধারণ সদস্যরাও এই আইন বাস্তবায়ন করতে পারে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রথাগত আইন বলতে কী বোঝায়?
কাজ- ২:	তোমার সমাজে কী ধরনের প্রথাগত আইন রয়েছে? খুঁজে বের কর।

পাঠ- ০৬ : প্রথাগত আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য

আমরা ইতঃপূর্বে জেনেছি যে, প্রথাগত আইন হচ্ছে যুগ যুগ ধরে কোনো জনগোষ্ঠীতে বংশ পরম্পরায় অনুসৃত হয়ে আসা চিরকালীন রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানুন বা সেসব রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের সমষ্টি। প্রথাগত আইন শুধু সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বেলায় প্রযোজ্য। যারা ঐ জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সদস্য নন তাদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত প্রথাগত আইন প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে সাধারণ আইন হলো সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইন, যা সারা দেশে এবং সব নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতি বজায় রাখার জন্য এবং নাগরিকদের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। এসব নীতিমালার ভিত্তিতে, যে বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য, সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়। সরকারের মন্ত্রিসভা এবং জাতীয় সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও স্বাক্ষর নিশ্চিত হলে তবে ঐসব বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়। আইনে পরিণত হওয়ার পর সেসব বিধি-বিধান দেশের আদালত বা বিচার-ব্যবস্থা এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ প্রশাসনের মাধ্যমে সারা দেশে সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে উঠে। এদিক থেকে রাষ্টীয় আইন হলো একটি ব্যাপকতর ও সর্বজনীন আইন। এর পরিধি ব্যাপক এবং সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

প্রথাগত আইন হলো শুধু বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর দ্বারা উদ্ভাবিত এবং ঐ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য আইন। এসব প্রথাগত আইন হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় অলংঘনীয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিসরে অবশ্য পালনীয় নয়। প্রথা ভাঙলে রাষ্ট্র শাস্তির বিধান করে না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী শাস্তির বিধান করে থাকে। বংশ পরম্পরায় যুগের পর যুগ ধরে পালন করতে করতে কোনো নিয়ম বা লোকাচার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে এতটাই অলঙ্ঘনীয় হয়ে পড়ে যে, তার ব্যতিক্রম ঘটানো বা প্রচলিত ঐ নিয়মকে অমান্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। এধরনের নিয়ম বা লোকাচার চিরকালের প্রথা বা বিধি-বিধানে পরিণত হয়। আর এসব প্রথার প্রতি সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর থাকে অগাধ বিশ্বাস, আস্থা এবং দুর্বলতা। এই নির্ভরতার সাথে জড়িত থাকে ঐ মানবগোষ্ঠীর লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস, আদি জ্ঞান, হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এবং চিরাচরিত কিছু অভ্যাস ও অনুশীলন।

বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলে না হলেও ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি- ১৯০০’ অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইন ও জীবনধারা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। কারণ দেশের সাধারণ আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি কয়েক দফা সংশোধনীর পর ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি- ১৯০০’ এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ আছে। এই শাসনবিধিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইন ও জীবনধারাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদে কী কী বিষয় আইন হিসেবে গণ্য হবে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, “আইন” অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো প্রথা বা রীতি। এদিক থেকে দেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের মাঝে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত প্রথা বা রীতি-নীতির জন্য এক ধরনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে বলা যায়।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রথাগত আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তা বুঝিয়ে লেখ।
কাজ- ২:	'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০' ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ০৭: প্রথাগত আইনে অপরাধের বিচার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় প্রথাগত আইনের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে। গুরুতর কোনো অপরাধ বা বিরোধের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো দেশের সাধারণ আইন বা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও সচরাচর প্রথাগত আইনের সাহায্যেই এখনও নিজেদের সব বিরোধ বা সমস্যা নিষ্পত্তি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ জেলা প্রশাসন এবং আইন-আদালত বহাল থাকলেও ফৌজদারি কিংবা ভূমি সংক্রান্ত গুরুতর অপরাধ ছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অন্যান্য সামাজিক বিরোধ বা সমস্যা প্রথাগত আইনের মাধ্যমে কারবারী, হেডম্যান বা রাজার আদালতে মীমাংসা করা হয়। এখানে প্রথাগত আইন দ্বারা সাধারণত যেসব বিষয়ে সমস্যার নিষ্পত্তি করা হয় সেগুলো হলো - বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সন্তান দত্তক গ্রহণ, স্ত্রীর মর্যাদা ও ভরণপোষণ, পিতৃত্ব এবং পিতার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, নাবালকের অভিভাবকত্ব, দান গ্রহণ ও হস্তান্তর, পরিবারের ভরণপোষণ, উইল সম্পাদন এবং অন্যের সম্পদের ক্ষতিসাধন, সম্মানহানি, অসামাজিক কার্যকলাপ প্রভৃতিসহ নানা সামাজিক বিরোধ ও অপরাধের বিচার। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের এসব প্রথাগত আইনের উৎস হলো সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, প্রাচীনকাল থেকে লালন করে আসা মূল্যবোধ ও বিশ্বাস; ধর্মীয় আনুগত্য ও অনুশাসন; প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য এবং নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো প্রথাগত আইনের মাধ্যমে সাধারণত যেসব অপরাধের বিচার কিংবা বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

অপরাধের ধরন -

১) জুমচাষের ভূমি বা অন্যান্য সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ;

২) ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি চুরি বা বেদখল করা;

৩) জনগোষ্ঠীর সামাজিক মালিকানার সম্পত্তি বা সেবা, যেমন– জনসাধারণের পানির উৎস, সামাজিক বন, রাস্তাঘাট, ধর্মীয় স্থান, শ্মশান প্রভৃতির ক্ষতি সাধন বা পবিত্রতা নষ্ট করা;

৪) অন্যের জমির ফসল বা বাগানের ক্ষতি সাধন করা;

৫) অন্যের সম্মানহানি এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা;

৬) পরিবার ও সমাজে কলহ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করা;

৭) মিথ্যা বলা, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতিসহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের সম্মান নষ্ট করা;

৮) পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা;

৯) সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করা;

১০) ভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা;

১১) ঋণ বা দেনা পরিশোধ না করা;

১২) সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অন্য কারও ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস বা অনুভূতিতে আঘাত করা;

১৩) বেপরোয়াভাবে ও নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস এবং বনের পশু-পাখি হত্যা করা;

১৪) শিক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা এবং ধর্ম পালনে বাধাদান প্রভৃতি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো দেশের সমতল অঞ্চলের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোও নিজেদের সমাজের নানা সমস্যা ও বিরোধ প্রথাগত আইনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে থাকে। তবে তাদের সমাজে দেশের সাধারণ প্রশাসন এবং বিচার-ব্যবস্থার প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামাজিক সমস্যা ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো প্রধানত তাদের প্রথাগত আইনই মেনে চলে। এখানে বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী মান্দিদের সমাজ-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুগ যুগ ধরে মান্দি জনগোষ্ঠী তাদের কিছু প্রথাগত নৈতিক আইন ও রীতি নীতি মেনে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখছে। তাদের বিশ্বাস হলো, সমাজে কেউ যদি দুর্নীতি, নিয়মভঙ্গ বা অন্যায় কাজ করে থাকে তাহলে সূর্য ও চন্দ্রের দেবতা সালজং এবং সুসিমে তাকে শাস্তি দেন। এছাড়া তাদের সমাজের প্রথাগত গ্রাম আদালত বা চ্রা-ও শাস্তির বিধান করে থাকে। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি বা বিধি-নিষেধ মেনে না চলা, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য না করা, সংরক্ষিত পবিত্র বন থেকে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা, একই গোত্রের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ না করা; চুরি, মিথ্যাচার ও হুমকি প্রদান; দেনা পরিশোধ না করা, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের ক্ষতি করা প্রভৃতি কাজ মান্দি সমাজে গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। এসব অপরাধের জন্য দেবতা কর্তৃক শাস্তি ছাড়াও সমাজে নানা শাস্তির বিধান রয়েছে। কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদে অনুরূপ প্রথাগত আইন সাঁওতাল, মণিপুরী, হাজং, কোচ, ডালু, বর্মন, খাসি, ওরাঁও, মুন্ডাসহ বাংলাদেশের সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে কমবেশি প্রচলিত রয়েছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইনে সাধারণত কী কী অপরাধের বিচার করা হয়?
কাজ- ২:	মান্দি সমাজে কী ধরনের প্রথাগত আইন চালু আছে? সাধারণত কোন কোন ক্ষেত্রে সেসব আইন প্রয়োগ করা হয়?

পাঠ- ০৮: সামাজিক বিচার ব্যবস্থা

ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দেশের সাধারণ বিচার-ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত সামাজিক বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য হয়তো নেই। তবে বিচার প্রক্রিয়া এবং বিচারের বিষয় ও পরিধির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য রয়ে গেছে। দেশের সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাধ্যমে অনুমোদিত ও প্রবর্তিত আইনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজে প্রচলিত সামাজিক বিচার-আচার সম্পন্ন হয় যুগ যুগ ধরে চলে আসা এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত রীতি-নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং অবশ্য পালনীয় নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে। সাধারণ বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রয়েছে দেশের আইন-আদালত, প্রশাসন বা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। আর প্রথাগত আইনে সামাজিক বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমাজের বিভিন্ন স্তরে নির্ধারিত নৈতিক ও সামাজিক কর্তৃপক্ষ। যাদের দায়িত্ব হলো সমাজের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। এই পর্বে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছু কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা-সম্পর্কে আলোচনা করবো।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নিজ নিজ প্রথাগত আইন থাকলেও সেসব আইনে কীভাবে সামাজিক বিচার-ব্যবস্থা পরিচালিত হবে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (শাসনবিধি) ১৯০০ দ্বারা নির্ধারিত আছে। এই শাসনবিধির আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেল প্রধান বা রাজা এবং তাঁদের নিচের স্তরে হেডম্যান ও কারবারীরা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজ নিজ প্রথাগত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়-বিচার ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করে থাকেন। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার-ব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত। যেমন - কারবারীর আদালত, হেডম্যানের আদালত এবং সার্কেল প্রধান বা রাজার আদালত। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত প্রথাগত শাসন-কাঠামো দেখানো হলো:

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন কাঠামো

পদবি	প্রশাসনিক এলাকা
রাজা বা রানি	চাকমা, বোমাং এবং মং সার্কেলের তিনজন সার্কেল প্রধান।
হেডম্যান	মৌজা প্রধান। বর্তমানে মোট ৩৯০ টি মৌজা রয়েছে।
কারবারী	পাড়া বা গ্রামের প্রধান।

চিত্র ৩.১ : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন কাঠামো

সামাজিক বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরটি হলো কারবারীর আদালত। কারবারী পাড়া বা গ্রামের প্রধান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি গোষ্ঠীপতিও। সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সামাজিক সমস্যা ও

অপরাধ প্রথাগত আইন অনুসারে তিনি নিষ্পত্তি করে থাকেন। তাঁর রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পারলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ হেডম্যানের আদালতে আপিল করতে পারে। হেডম্যান হলেন মৌজার প্রধান। কয়েকটি পাড়া বা গ্রাম নিয়ে এক একটি মৌজা গঠিত হয়। হেডম্যান তার মৌজার অধিবাসীদের দ্বারা উপস্থাপিত বিরোধের সকল বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। তাঁর রায়ে অসন্তুষ্ট পক্ষ ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য রাজার আদালতে আপীল করতে পারে।

হেডম্যান এবং রাজা দোষী ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারেন। তাঁরা অন্যায়ভাবে সংগৃহীত মালামাল বা সম্পদ ফেরত প্রদানে দোষী ব্যক্তিকে বাধ্য করতে পারেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	দেশের সাধারণ বিচার-ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত সামাজিক বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
কাজ- ২:	পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি–১৯০০ অনুযায়ী হেডম্যান এবং কারবারীর কী কী দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে?

পাঠ - ০৯ এবং ১০: কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার ব্যবস্থার উদাহরণ

চাকমা সমাজে নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ: রক্ত সম্পর্কিত নিকটাত্মীয় এবং ভিন্ন ধর্ম ও জাতির পাত্রের সাথে বিবাহ চাকমা সমাজে নিষিদ্ধ। এ ধরনের কোনো বিবাহকে নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ বলে গণ্য করা হয়। নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতিকে সামাজিক আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করার বিধান রয়েছে। সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শপথনামা পাঠ কিংবা অন্যান্য প্রথাগত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করলেও এ ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ বলে গণ্য হবে। এ ধরনের অননুমোদিত বিবাহ বা নিষিদ্ধ সম্পর্কের শাস্তি স্বরূপ চাকমা সমাজের প্রথা অনুযায়ী জরিমানা হিসাবে শূকর ও অর্থদণ্ড দিতে হয়।

সম্পত্তিতে চাকমা নারীর উত্তরাধিকার: চাকমা সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রথাগত আইন অনুযায়ী তার প্রতিকারের বিধান রয়েছে। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, চাকমা সমাজে নারীরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। কোনো পিতা ইচ্ছা করলে তার সম্পত্তি পুত্র কন্যা নির্বিশেষে সবার মাঝে সমান ভাবে বণ্টন করে দিতে পারেন। এ ছাড়া কোনো পিতা মাতা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে কন্যারা তাদের সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। সন্তান বা অন্য কোনো উত্তরাধিকারী ছাড়া ভাই মারা গেলে বোনেরাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এছাড়া বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। বর্তমানে চাকমা সমাজের নারীরা যাতে পুরুষ উত্তরাধিকারীদের মতো সম্পত্তির সমান অংশ পায় তার জন্যে চাকমা সমাজের প্রথাগত আইনের সংশোধন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা অব্যাহত আছে।

লুসাই জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার ব্যবস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে লুসাইরা জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী । লুসাই সমাজপতি বা সর্দারকে 'লাল' নামে অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলের পূর্বে 'লাল'-এর কর্তৃত্বাধীনে লুসাই সমাজের বিচার ও শাসন কার্য পরিচালিত হতো। সমাজপতি বা সর্দারকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপা (কাউন্সিলর), পুইথিয়াম (পুরোহিত), জালেন (নিরপেক্ষ), রামহুয়ালতু (ভূমি বিশেষজ্ঞ), টুলাংআউ (ঘোষক) এবং থিরদেং (কামার) এসব পদবিধারীরা নিয়োজিত ছিল। পরে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি প্রবর্তিত হওয়ায় এর অধীনে কারবারী, হেডম্যান এবং সার্কেল চিফ- এই তিন স্তরের প্রথাগত আদালতের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় সামাজিক বিরোধ নিষ্পন্ন হয়ে আসছে। লুসাই সমাজের প্রথাগত আইন অনুসারে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী আইনগত উত্তরাধিকারী নন। মৃতের পুত্র সন্তানরাই পিতার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। আর পুত্র সন্তান যদি না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র বা গোত্রের রক্ত সম্পর্কিত পুরুষ আত্মীয়রাই মৃতের সম্পত্তি পেয়ে থাকে। কণিষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পত্তির বড় অংশ পেয়ে থাকে। কারণ লুসাই সমাজের রীতি অনুসারে তাকে পিতা মাতার ভরণপোষণ করতে হয়। তবে মৃতের বিধবা স্ত্রী সন্তানদের সাথে বসবাস করলে পরিবারে তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়। আর বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করলে তাকে আগের স্বামীর পরিবার থেকে আমৃত্যু ভরণপোষণ লাভের অধিকার হারাতে হয়।

কন্যা সন্তানেরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হলেও বিয়ের আগ পর্যন্ত পরিবার থেকে যাবতীয় ভরণপোষণ পেয়ে থাকে। তবে পিতা মাতা বা অন্য কেউ যদি কোনো সম্পত্তি দান বা উইল করে দেন তাহলে কন্যাদের সে সম্পত্তি পেতে কোনো বাধা নেই। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণেও স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে। বিবাহের আগে বা পরে নিজের উপার্জিত অর্থে বা স্বীকৃত অন্য কোনো উপায়ে সম্পত্তি অর্জন করলে তার উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা বা অধিকার লুসাই নারী ভোগ করতে পারেন । সমাজ স্বীকৃত সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই সমাজপতি বা সামাজিক আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। লুসাই ভাষায় বিবাহ বিচ্ছেদকে "ইনঠেন" বলা হয়।

বিধবা কিংবা স্বামী বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ লুসাই সমাজে স্বীকৃত। তবে স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ না করে বা দাম্পত্য সম্পর্ককে নিরবচ্ছিন্ন না রাখে কিংবা যদি কন্যা সন্তান বা স্ত্রী নিজের বেলায় উপরে উল্লিখিত যাবতীয় অধিকার খর্ব হচ্ছে মনে করে, সেক্ষেত্রে সমাজপতি 'লাল' কিংবা সামাজিক ও দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে তারা নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

ওরাঁও জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার ব্যবস্থা: সমাজের যাবতীয় বিবাদ নিষ্পত্তি এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ওরাঁওদের গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনকে তাদের ভাষায় পাঞ্চেস বলা হয়। গ্রামের বয়স্ক সাত আটজন ব্যক্তি নিয়ে সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য পাঞ্চেস গঠিত হয়। প্রতিটি গ্রামে একজন মহাতোষ এবং একজন পুরোহিত বা নাইগাস থাকেন। মূলত তাদের নেতৃত্বে পাঞ্চেস পরিচালিত হয়। পাঞ্চেস-এর কাছে বিচার প্রার্থীকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ফি পরিশোধ করতে হয়। সাধারণ বিবাদের জন্য এই ফি-এর পরিমাণ হয়ে থাকে ১.২৫ টাকা এবং জমি সংক্রান্ত বিবাদের জন্য ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত। পাঞ্চেস এর রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পারলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ "পাঁড়হা-পাঞ্চেস"-এ আপীল করতে পারে। পাঁড়হা হলো সাধারণত সাত থেকে বারোটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি কনফেডারেশন।

গ্রামের পাঞ্চেসের মধ্য থেকে একজনকে পাঁড়হা প্রধান বা রাজা নিযুক্ত করা হয়। ওরাঁও ভাষায় যার নাম "পাঁড়হা বেলাস"। তার নেতৃত্বে গঠিত হয় "পাঁড়হা পাঞ্চেস"। সমাজে বা গ্রামগুলোর মধ্যে কোনো বিবাদ সংগঠিত হলে "পাঁড়হা পাঞ্চেস" -এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক এসব বিচার ব্যবস্থা বা পাঞ্চেসের সদস্যগণ কোনো পারিশ্রমিক নেননা। তারা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। তবে সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে বর্তমানে ওরাঁও সমাজের অনেকেই প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার চেয়ে দেশের সাধারণ আইন আদালতের প্রতি বেশি আগ্রহী।

মান্দি জনগোষ্ঠীর সামাজিক-বিচার ব্যবস্থা: ওরাঁওদের মতো মান্দি জনগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত কিছু সামাজিক বিচার প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। চুরি, অগ্নিসংযোগ, মিথ্যাচার, সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা, হুমকি প্রদান, শ্লীলতাহানির চেষ্টা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মান্দি সমাজের গ্রাম প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মিলে শাস্তির বিধান করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো চোর ধরা পড়ে তাহলে তাকে চুরি যাওয়া যাবতীয় সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে বা টাকার অংকে সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কারও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই বাড়ি পুনঃনির্মাণ করে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় এবং গ্রাম প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানাও আদায় করা হয়। ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহণকারীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে তা পরিশোধ করতে হয়। সমাজের কোনো সদস্য যদি কাউকে হুমকি দেয় তাহলে সেই অপরাধের জন্য তাকে কমপক্ষে এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়। তবে বাংলাদেশে নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে প্রথাগত সামাজিক আদালতের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় মান্দি সমাজের অনেকেই এখন দেশের সাধারণ প্রশাসন বা বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হন। বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে নিজস্ব প্রথাগত বিচার-ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেগুলোর কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি এখনও নেই। তার উপর দেশের সাধারণ প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইন ও বিচার-ব্যবস্থার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	চাকমা সমাজে অননুমোদিত বিবাহ বলতে কী বোঝায়? সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে চাকমাদের প্রথাগত আইনের অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
কাজ- ২:	লুসাই নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত নেতৃত্ব এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বিবরণ দাও।
কাজ- ৩:	ওরাঁও নৃগোষ্ঠীর পাঞ্চেস প্রথা এবং সামাজিক বিচারে জরিমানার কিছু উদাহরণ তুলে ধর।
কাজ- ৪:	মান্দি নৃগোষ্ঠীর সামাজিক বিচারে অভিযুক্তকে কী ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. মং সার্কেল কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. খাগড়াছড়ি
খ. রাঙামাটি
গ. বান্দরবান
ঘ. ময়মনসিংহ

২. মানব সভ্যতার অগ্রগতির ফলে-

i. নগরায়ণ ঘটে
ii. গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে ওঠে
iii. সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ঐশী কান্তির বাড়ি রাজশাহী জেলার কালীতারা গ্রামে। একটি পশু হত্যা নিয়ে তাদের সাথে পাশের গ্রামের বিবাদ দেখা দেয়। দুপক্ষই একটি আদালতে উপস্থিত হলে বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে শুনানি হয়। দুপক্ষ এ আদালত থেকে সুবিচার পায়।

৩. কালীতারা গ্রামে কোন আদালতের কথা বলা হয়েছে?

ক. ল’বীর
খ. সেংকুর
গ. গ্রামপঞ্চায়েত
ঘ. পরগনা পঞ্চায়েত

৪. ঐশী কান্তির প্রাপ্ত বিচারে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর-

i. সামাজিক সংহতি রক্ষিত হয়েছে
ii. সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে
iii. প্রথাগত অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

ক. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে সংহতির প্রতীক কে?

খ. প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে 'অ' চিহ্নিত অঞ্চলে যে শাসন বিধি কার্যকর তার ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. সমতল ভূমিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপর উক্ত শাসন বিধি কতোটুকু কার্যকর- বিশ্লেষণ কর।

২. অনুপম খিসা রাঙামাটি জেলার একটি গ্রামে বসবাস করেন। প্রতিবেশীর সাথে জমি নিয়ে একদিন তার বিবাদ হয়। তিনি পাড়ার প্রধানের নিকট বিচার চান। পাড়া প্রধানের বিচার তার মনোপুত হলো না। তিনি পাড়া প্রধানের উপরের প্রধানের নিকট বিচার প্রার্থী হন। উক্ত প্রধান উভয় পক্ষের যুক্তি তর্ক শুনে সুন্দর সমাধান প্রদান করেন।

ক. চ্রা পান্থে কী?

খ. হাজংদের চাকলা কীভাবে গঠিত হয়?

গ. অনুপম খিসা যে প্রধানের নিকট সুবিচার পেলেন তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজের জটিল সমস্যা সমাধানে উক্ত প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আন্দোলন ও সংগ্রামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

আন্দোলন-সংগ্রাম-বিদ্রোহে বাংলাদেশের এক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। শোষণ, জুলুম আর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ বিদ্রোহ করেছে বহুবার। সংগ্রাম-আন্দোলনে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের অধিকার আদায় বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছে-সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, টংক ও হাজং বিদ্রোহ, প্রভৃতি। এমনকি ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা আন্দোলন এবং এরই ধারাবাহিকতায় একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের অনেক অবদান রয়েছে। এখানে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- উপনিবেশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, টংক ও হাজং বিদ্রোহ এবং তেভাগা আন্দোলনের বিবরণ দিতে পারব ;
- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- মুক্তিযুদ্ধে সমতলের এবং পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব ;
- মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি জানতে আগ্রহী হব এবং এ যুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের অবদান জানতে পারব ;
- মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনকারী ও খেতাবপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ;
- মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলি জানতে আগ্রহী হব এবং এ যুদ্ধে বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকজনের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে উদ্বুদ্ধ হব ।

পাঠ- ০১: ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগণ বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে থাকে। ভাষা, সংস্কৃতির উপর পাকিস্তানিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শুরু হয় প্রতিবাদ, আন্দোলন, সংগ্রাম। ভাষা আন্দোলন থেকে উন্মেষ ঘটে ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভূ-ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মধ্যদিয়ে একরকম বৈরী পরিবেশে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি তথা স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়।

ইংরেজ রাজত্বের দু'শো বছরের শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে কৃষকরাই প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের কৃষকদের বিদ্রোহগুলি এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ২৪ পরগনা জেলায় তিতুমীর বিদ্রোহ, ফরিদপুর জেলায় দুদু মিয়ার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল চাষিদের বিদ্রোহ, ১৭৭৯ সালের চোয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালে খাসি বিদ্রোহ, ১৮১৮ সালের নাগা বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনে ছিল কৃষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। আমরা দেখি ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি শাসন-শোষণ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও মূল জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মণিপুরী, মান্দি, খাসি, কোচ, হাজং, ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডা, মাহালীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সবারই কমবেশি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইতিহাসে এদের অহংকারদীপ্ত এসব সংগ্রামের নানা নামও রয়েছে। যেমন— সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ, টংক আন্দোলন প্রভৃতি। এমনকি তেভাগা আন্দোলনেও উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের সেই বীরনায়ক ভ্রাতৃদ্বয় সিধু ও কানু, মুন্ডা বিদ্রোহের মহানায়ক বীরসা মুন্ডা, টংক আন্দোলনের খ্যাতিমান নারী কুমুদিনী হাজংসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক বীর নারী-পুরুষ ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। আর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে । ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা নির্যাতিতও হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ সবারই দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অসামান্য অবদান রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ইংরেজদের দুশো বছরের শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রথম কারা বিদ্রোহ করে?
কাজ- ২:	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্রিটিশ বিরোধী পাঁচটি আন্দোলনের নাম উল্লেখ কর।

পাঠ- ০২: সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল একবার নয় বারবার। ১৭৮০-১৭৮৫ সালে তিলকা মাঝির (মুরমু) নেতৃত্বে প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজ শাসনের ভীত কেঁপে উঠেছিল। পরে আবার ১৮৫৫, ১৮৭১, ১৮৭৪, ১৮৮০-১৮৮১ এবং ১৯৩৩ সালে জিতু ও সামুর বিদ্রোহ হয়। এ সকল বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকার, জমিদার ও মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে। সাঁওতালরা অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে দামিন-ই-কো নামে যে জনপদটি গড়ে তুলেছিল (বর্তমান ভারতে), সে জনপদ একদিন আর তাদের নিজস্ব রইলো না। সে জীবনে ঢুকে গিয়েছিল ইংরেজ দারোগা, মহাজন ও লোভী ব্যবসায়ী শ্রেণি। এই অর্থলোভী গোষ্ঠী সাঁওতাল পরগনা থেকে বিপুল পরিমাণ ধান, সরিষা ও বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজ গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে প্রথমে মুর্শিদাবাদ ও পরে কলকাতায় চালান দিতো। সেখান থেকে এ দ্রব্য সামগ্রী ইংল্যান্ডে রফতানি করা হতো। এ দ্রব্য সামগ্রীর জন্য ব্যবসায়ীগণ সাঁওতালদের সামান্য পরিমাণ অর্থ, লবণ, তামাক অথবা কাপড়-চোপড় দিতো। এভাবে মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণির শোষণ ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। সাঁওতালদের অভাবের সময়ে কিছু অর্থ বা দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করেই মহাজন শ্রেণি সাঁওতালদের সারা জীবনের জন্য দাস হিসাবে কিনে নিত। মহাজনেরা সাঁওতালদের মধ্যে ঋণের কারবার চালু করেছিল। এ ঋণের সুদের কোনো নির্দিষ্ট হার ছিল না। একজন সাঁওতালকে তার ঋণের জন্য তার জমির ফসল, হালের বলদ, এমনকি নিজেকে এবং তার পরিবারকেও হারাতে হতো। আর সেই ঋণের দশগুণ পরিশোধ করলেও তার ঋণের বোঝা পূর্বে যা ছিল পরেও তাই থাকতো। সহজ-সরল সাঁওতালগণ এসব বহিরাগত লোভী মানুষকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হতো। তাছাড়া মহাজনদের দেওয়া ঋণের সুদ-আসল পরিশোধ করার সামর্থ্যও অধিকাংশ সাঁওতালদের ছিল না। এর ফলে ঋণ গ্রহণের পরদিনই অনেক সাঁওতালকে সপরিবারে মহাজনের বাড়িতে দাসত্ব করতে যেতে হতো। তাদের এ জীবনে ঋণ আর কোনোদিনই শোধ হতো না। মৃত্যুর সময় তারা তাদের বংশধরদের জন্য রেখে যেত বিশাল ঋণের বোঝা। এই অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য একদিন সাঁওতালরা মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে।

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন সাঁওতাল পরগনার ভগনাডিহি গ্রামে সাঁওতালরা সমাবেশ করে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়। এই সমাবেশের নেতৃত্ব দিয়েছিল দুই সাঁওতাল সহোদর সিধু ও কানু। তারা সেদিন দাবি আদায়ের জন্য কলকাতা অভিমুখে পদযাত্রা করেছিল। ক্রমে ক্রমে কানু ও সিধু দুই ভাই সাঁওতাল জাতির মুক্তিদাতা রূপে আর্বিভূত হলেন। তারা গ্রামে জানিয়ে দিলেন তাদের বিদ্রোহের কথা, ভগবানের নির্দেশের কথা। তীর-ধনুক নিয়ে এই প্রতিবাদ পদযাত্রায় সেদিন হাজির হয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল। এরপর সরকারি বাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে গোটা সাঁওতাল এলাকায়। সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়ে খুন করে বাঙালি মহাজন, দারোগাসহ সুদখোর ব্যবসায়ীদের। ব্রিটিশ সরকার তখন এই বিদ্রোহ দমন করতে তার সকল অস্ত্র গোলাবারুদ ও সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময় মুর্শিদাবাদ থেকে ৫০০ অশ্বারোহী, ৪০টি হাতি ও ২টি কামান পাঠানো হয়। প্রথম দিকে যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটে। তখন সাঁওতাল অধ্যুষিত বিস্তৃর্ণ এলাকায় সাঁওতালদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বর্ষাকাল চলে গেলে নতুন গোলা-বারুদ ও শক্তি নিয়ে আবার আক্রমণ চালায়। সাঁওতালরা

পাহাড়ে আর সরকারি সৈন্যরা সমতলে। চতুর ইংরেজ বাহিনী বুঝতে পারে পাহাড়ে কামান-বন্দুক কাজে আসবে না তাই তারা বিদ্রোহীদের সমতলে নামিয়ে আনার ফাঁদ পাতে আর সে ফাঁদে ধরা দিয়ে সাঁওতালরা নিচে নেমে এলে চারদিক থেকে একযোগে আক্রমণ চালায়। দেবতার আশীর্বাদে বন্দুকের গুলি গায়ে লাগবে না এই বিশ্বাসে সাঁওতালরা এগিয়ে এসে মারা পড়তে থাকে। শেষে যুদ্ধে সাঁওতালরা পরাজিত হয়। প্রায় বিশ হাজার সাঁওতাল মৃত্যুবরণ করে। আহত ও বন্দি হয় সাঁওতাল নেতা সিধু ও কানু। মূলত ইংরেজ সৈন্যদের রণকৌশল এবং বন্দুক-কামানের কাছে পরাজিত হয় সাঁওতালরা। এভাবেই সাঁওতালদের স্বাধীনতার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	কোন সময় প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল ? কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?
কাজ- ২:	১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন সাঁওতালরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে কারা ছিলেন ?

পাঠ- ০৩: মুন্ডা বিদ্রোহ

ঐতিহাসিক মুন্ডা বিদ্রোহ উপমহাদেশের ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে স্মরণীয়। এই বিদ্রোহ বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে শুরু হয়, যিনি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিরসা ১৮৭৫ সালের এক মুন্ডা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মিশন পরিচালিত স্কুলে সামান্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষিত করার জন্য কোনো স্কুল ছিল না। কারণ তারা মনে করত নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষিত হওয়া উচিত নয়। মুন্ডা জনগণ বিরসাকে ভগবান হিসাবে গণ্য করত। যদিও তিনি সাধারণ মুন্ডাদের মতো বঞ্চনা, ক্ষুধা, অপুষ্টির শিকার ছিলেন। বিরসার যুদ্ধ শুধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই ছিল না, ছিল ভারতীয় মহাজন, পুরোহিত, ভূ-স্বামী, চা বাগান মালিক–যারা ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করত তাদের বিরুদ্ধে। বিরসা সিদ্ধান্ত নিলেন সুশাসন ও নীতির ভিত্তিতে নৃগোষ্ঠীদের জন্য একটা রাজ্য গঠন করবেন এবং ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে নৃগোষ্ঠীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকেন। ১৮৯৯-১৯০০ সালে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ভারতের রাঁচির দক্ষিণ অঞ্চলে এ বিদ্রোহ পরিচালিত হয়। দুই বছর কারাবাসের পর ১৮৯৭ সালে মুন্ডা ছাড়া পেয়ে জায়গীরদার ঠিকাদারদের শোষণ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে একটি প্রবল বিদ্রোহ বা "উলগুলান" এর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মূলত হারানো জমির অধিকার ফিরে পেতেই এ বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর সিংভুম, তামার এবং বাসিয়ার মধ্যে যত সরকারি অফিস, পুলিশ স্টেশন, মিশন হাউস ছিল সেখানে বিরসা ও তার অনুসারীরা তীরের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে তীর ছুড়ে যুদ্ধ করেন। কিন্তু সরকারি বাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেন নি। ৯ই জানুয়ারি ১৯০০ সালে তিনি গ্রেফতার হন। কিছুদিন পর রাচি কারাগারে বিরসার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। বিরসা মুন্ডা মারা গেলেও মুন্ডাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেমে থাকেনি।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রথম মুন্ডা বিদ্রোহ ঘটেছিল কেন? কে নেতৃত্ব দিয়েছিল?
কাজ- ২:	বিরসার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিল কত সালে এবং কোথায়?

পাঠ- ০৪: হাজং বিদ্রোহ ও টংক আন্দোলন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হাজংদের রয়েছে গৌরবময় ও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের ইতিহাস। বিভিন্ন সময় তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এদেশের হাজংদের ভূমিকা ছিল খুবই উজ্জ্বল। রাজা বিদ্রোহ, হাতিখেদা আন্দোলন, কৃষক-বিদ্রোহ, টংক-আন্দোলন এমনকি দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধেও হাজংদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অবদান উল্লেখযোগ্য।

হাতিখেদা আন্দোলন: হাজং সম্প্রদায় সরল জ্ঞানে জমিদারদের একসময় দেবতুল্য ভাগ্যবিধাতা রূপে বিবেচনা করতো। জমিদারদের সকল কাজেই তারা সহযোগিতা করতো। এ সুযোগে জমিদাররা হাজংদের বেগার খাটিয়ে বড় অংকের অর্থ আয়ের পথ সৃষ্টি করে নিত। জমিদারের নির্দেশে হাতি ধরার মতো কঠিন কাজ করার শর্তে কিছু জমি তারা লাভ করতো। জীবন বাজি রেখে হাতি ধরার মতো কঠিন কাজ করে যথাযথ পারিশ্রমিক না পাওয়ায় তারা এক সময়ে এ কাজে অস্বীকৃতি জানায়। এক পর্যায়ে এভাবেই ১৮৭৩ সালে হাজংরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

ক্রমে তারা হাতি ধরার কাজে অস্বীকৃতি জানিয়ে অন্য কাজে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলে জমিদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে হাজংদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। পরবর্তীতে ১৮৯৩ সালে মনা সর্দার নামে একজন হাজং নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। তারা আর হাতি ধরার কাজে অংশ নেবে না বলে ঘোষণা দেয়। অপরদিকে জমিদারদের অত্যাচারে পূর্ব থেকেই বিক্ষুব্ধ মান্দি চাষিরাও হাজংদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। মান্দি ও হাজংদের সম্মিলিত বিদ্রোহ যখন তীব্র হয়ে উঠতে শুরু করে, তখনই জমিদাররা হাজং নেতা মনা সর্দারকে হাতির পায়ের তলায় পিষে নির্মমভাবে হত্যা করে।

টংক আন্দোলন: টংক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কৃষক আন্দোলন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ছিল এ আন্দোলনের ব্যাপ্তি। টংক মানে ‘ধান কড়ারি খাজনা’। টংক প্রথার শর্তানুসারে জমিতে ফসল হোক বা না হোক চুক্তি অনুযায়ী টংকের ধান জমির মালিককে দিতেই হতো। ফলে কোনো বছর যদি জমিতে ফসল না হয় বা কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবুও কৃষককে তার নির্ধারিত খাজনা পরিশোধ করতে হতো। এতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হাজংসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রান্তিক কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক দূরবস্থায় পড়ে যেতো। কোনো কারণে টংকের ধান পরিশোধ করতে না পারলেই কৃষকদের উপর নেমে আসতো অত্যাচার ও নিপীড়ন।

কৃষকরা ধানের হিসাবে তাদের জমির খাজনা শোধ করতো। চুক্তি অনুযায়ী ১.২৫ (সোয়া) একর জমির জন্য ১০ থেকে ১৫ মন ধান দিতে হতো যা টাকার হিসাবে দ্বিগুণেরও বেশি। এ চুক্তি গারো পাহাড় অঞ্চলে টংক প্রথা নামে পরিচিত। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উত্তর কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দী থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। অথচ ঐ সময়ে জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা। আর ঐ ধানের দাম ছিল প্রতি মণ সোয়া দুই টাকা মাত্র। ফলে প্রতিসোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হতো পনের টাকা থেকে প্রায় বিশ টাকা। এই প্রথায় শুধু জমিদারই লাভবান হতো তা নয়, মধ্যবিত্ত ও মহাজনরাও লাভবান হতো।

টংক প্রথা কৃষকদের জন্য ছিল অভিশাপ। হাজংরা এই অভিশপ্ত প্রথার হাত থেকে মুক্তি পেতে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রথমে টংকের কুফল বিষয়ে গ্রামে গ্রামে বৈঠক করা হয়। পরে ঐক্যমত সৃষ্টি হলে কৃষকরা জমিদারদের টংক ধান দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এতে টংক চাষিদের ভাগ্যে অনেক দুর্ভোগ নেমে আসে। কেননা জমিদারগোষ্ঠী টংক ধান আদায়ের জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। মূলত হাজং কৃষকরাই টংক উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে তাদের আন্দোলন করতে হয় জমিদারগোষ্ঠীর সাথে। পরে ব্রিটিশ সরকারের সাথে এবং শেষে পাকিস্তান সরকারের সাথেও এ নিয়ে সংঘর্ষ হয়। হাজংদের এ টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেড মণি সিংহ।

টংকের অত্যাচারের যন্ত্রণা এবং মুক্তির বাসনা শুধু হাজং নয়, মুসলমানসহ সকল শ্রেণির লোকদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। এর হাত থেকে রক্ষার উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল তখন হাজং কৃষকরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এজন্য টংক আন্দোলন হাজং আন্দোলনে পরিণত হয় এবং অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন সব হাজংদের উপরই নেমে আসে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে টংক আন্দোলন প্রথম দানা বাঁধতে শুরু করে দশাল গ্রামে। পরে সেই আন্দোলনের প্রবাহ কিছু কালের মধ্যেই তড়িৎ গতিতে হাজং অঞ্চলগুলোতে বিস্তার লাভ করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটে। প্রথম দিকে কমরেড মণি সিংহ একাই কৃষকদের মাঝে কাজ করতে থাকেন। পরে আরও কয়েকজন কর্মী এসে যোগ দেন। যেমন–ভূপেন ভট্টাচার্য, প্রমথ গুপ্ত, জলধর পাল প্রমুখ। তাছাড়া রবি নিয়োগী, পুলিন বকসী, আলতাব আলী বিভিন্ন সময়ে তাকে কাজে সহযোগিতা করেন।

এ সময় হাজং কৃষকদের মধ্যে সচেতন ও সক্রিয় সংগঠন গড়ে উঠে। ১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় কৃষক সম্মেলন। মণি সিংহ-এর নেতৃত্বে কয়েক শত হাজং কৃষক যোগদান করে এই সম্মেলনে। পরে

সুসং দুর্গাপুর হাইস্কুল মাঠে টংক প্রথা উচ্ছেদের জন্য পুনরায় আন্দোলনের প্রস্তুতি সভা করার পরেই সরকারের কড়া নজর তাদের উপর পড়ে। ১৯৪৬ সালের ১ জানুয়ারি দুর্গাপুরের বিরিশিরিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এ সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে বিদ্রোহী হাজং কৃষকসহ অন্যান্য কৃষককে খুঁজতে শুরু করে। পুলিশ বহেরাতলী গ্রামে তল্লাশি চালায়। অবশেষে এ গ্রামে কাউকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত পুলিশ বাহিনী লংকেশ্বর হাজং-এর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী কুমুদিনী হাজংকে ধরে নিয়ে বিরিশিরি ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হয়। হাজং গ্রামগুলোতে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লে শতাধিক হাজং নারী-পুরুষ সশস্ত্র বাহিনীর পথরোধ করে। এ সময় বিপ্লবী রাশিমণি হাজং তাঁর দলবলসহ কুমুদিনী হাজংকে বাঁচাতে পুলিশ বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ বাহিনীও নৃশংসভাবে গুলি চালায়। ফলে এক সময় রাশিমণি হাজং গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ক্ষিপ্ত হাজং পুরুষদের বল্লমের আঘাতে ঘটনাস্থলেই ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার বাহিনীর দুজন পুলিশ নিহত হয়। অন্যরা কুমুদিনী হাজংকে ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। একজন নারী হয়ে অন্য একজন নারীকে বাঁচাতে গিয়ে জীবন দিয়ে রাশিমণি হাজং হাজংদের আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

পাঠ- ০৫: তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন কৃষি উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে সংগঠিত বর্গাচাষিদের আন্দোলন। এ আন্দোলনে সকল নৃগোষ্ঠীর চাষিরাই অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভূমিমালিক এবং ভাগচাষিদের মধ্যে উৎপাদিত শস্য সমান দুইভাগ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে বর্গাদাররা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৬ সালে আমন ধান উৎপাদনের সময়কালে বাংলার উত্তর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের ভাগচাষিরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল কাটতে নিজেরাই মাঠে নামেন এবং তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেন। দুটি কারণে এটি বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত। প্রথমত, তারা দাবি করে যে, অর্ধেক ভাগাভাগির পদ্ধতি অন্যায়। উৎপাদনে যাবতীয় শ্রম এবং অন্যান্য বিনিয়োগ করে বর্গাচাষি; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ, শ্রম এবং অবকাঠামোতে ভূমিমালিকের অংশগ্রহণ থাকে অতিনগণ্য। এ কারণে, মালিকরা পাবেন ফসলের অর্ধেক নয় বরং এক-তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয়ত, বর্গাচাষিরা দাবি করেন যে উৎপাদিত শস্যের সংগ্রহ মালিকদের কাছে নয় বরং থাকবে বর্গাচাষিদের বাড়িতে এবং ভূমিমালিক খড়ের কোনো ভাগ পাবেন না।

আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারণ করে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর এবং চব্বিশ পরগনা জেলায়। ভূমিমালিকরা ভাগচাষিদের এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করে। তারা পুলিশ দিয়ে আন্দোলনকারীদের অনেককে গ্রেফতার করে এবং তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু জমিদারদের দমন-পীড়ন আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তেভাগা আন্দোলনের অগ্রবর্তী ধাপ হিসাবে কৃষকরা কোনো কোনো

এলাকাকে তেভাগা এলাকা বা ভূস্বামী মুক্ত ভূমি হিসাবে ঘোষণা করে এবং তেভাগা কমিটি স্থানীয়ভাবে সেসব এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তেভাগা আন্দোলনের চাপে অনেক ভূস্বামী তেভাগা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেন এবং তাদের সাথে আপস করেন।

তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম কিংবদন্তী হলেন নাচোলের রানীমা ইলামিত্র। জমিদার-জোতদারদের হাত থেকে বাঁচতে ১৯৩৬ সালে প্রথম গঠিত হয় সর্বভারতীয় কৃষক সমিতি। তারপর ১৯৪০ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ চাষীদের দেওয়ার পক্ষে কৃষক সমাজ আস্তে আস্তে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। তখনই ইলামিত্র এই আন্দোলনে শরিক হোন এবং অল্প দিনেই তিনি আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন পুলিশ ঠাকুরগাঁয়ে তেভাগা আন্দোলনের নেতা ডোমা সিং কে গ্রেফতার করতে গেলে শত-শত কৃষক তা প্রতিরোধ করে। এসময় পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সফরচাঁদ, মুকুটসিংহ ও নেনদেনিসিংহ। পুলিশের নির্যাতন-নিপীড়নে আন্দোলন যখন কিছুটা ভাটা পড়ে যায় তখনই এগিয়ে আসে নাচোলের রাণী ইলামিত্র। তিনি অল্প দিনেই সবার কাছে রাণী মা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রথম হাজং বিদ্রোহ ঘটেছিল কেন? কে নেতৃত্ব দিয়েছিল?
কাজ- ২:	টংক আন্দোলন কী? এটি কাদের আন্দোলন ছিল?

পাঠ- ৬ ও ৭ : ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সে আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদানও কম নয়। তারাও ছোট ছোট শহরে মাতৃভাষার অধিকারের দাবিতে সমাবেশ ও মিছিল করেছে।

১৯৫২ সালে বাঙালিদের ভাষা আন্দোলনের সময় বীরকুমার তঞ্চঙ্গা দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া শিলক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। এ সময় তিনি অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। একুশে ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগঠিত করে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' এই শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় মিছিল করেন। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত মণিপুরী ছাত্রছাত্রীরা ভাষার দাবিতে মিছিল ও শ্লোগানে অংশগ্রহণ করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মণিপুরী যুব-ছাত্ররা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় অংশ নিয়েছিল।

১৯৭১- এর স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক মুক্তিযোদ্ধা দেশকে হানাদার মুক্ত করতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। সেসময় অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, সম্পদ লুঠ থেকে শুরু করে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতাল: ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতালসহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সাঁওতাল বিদ্রোহের চেতনায় তারা লড়েছে প্রতিটি মুক্তির সংগ্রামে। দেশকে পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালরা রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। সাঁওতাল নারীরাও সেদিন পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে ওরাঁও: মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্ন থেকেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ওরাঁও সম্প্রদায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল ও নিয়ামতপুর এলাকায় শত শত ওরাঁও যুবক মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এঁদের মধ্যে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার টুকিয়াপাড়ার কাশিনাথ টপ্প, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার মোকিম ওরাঁও, গণেশ ওরাঁও অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহিদ হন চাঁপাইনবাবগঞ্জের বেলপুরের শ্রীচরণ ওরাঁওসহ অনেকে। অন্যদিকে ওরাঁওরা রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে কখনো পৃথক কখনো বা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলেমিশে যুদ্ধ করেছে। রংপুরের বলদি পুকুর ও আশপাশের এলাকা থেকে তারা মুক্তিযোদ্ধা বুদু ওরাঁওয়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে তীর-ধনুক নিয়ে রংপুর সেনানিবাস আক্রমণ করে। যুদ্ধে অনেক ওরাঁও মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

মুক্তিযুদ্ধে চাকমা: পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের সাথে ছয় দফা দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলও আন্দোলিত হয়েছিল। সে সময় অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো চাকমা ছাত্র-যুব সমাজ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও দোকানপাট, রাস্তা-ঘাট অচল করে দিয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ। সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করে। সেসময় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি চাকমা তরুণ-যুবকদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কোকনদাক্ষ রায়ও (রাজা ত্রিদিব রায়ের চাচা) মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েছিলেন। এ সময় কয়েকশ চাকমাসহ অন্যান্য জাতির

ছাত্র-যুবকও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এ চাকমাসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যারা ছিল, তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে রমণী রঞ্জন চাকমা রামগড় সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে শহিদ হন। সিপাহি মেহরঞ্জন চাকমা বগুড়া সেক্টরে নিখোঁজ হন। তখন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীতে চাকরিরত এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে অন্যতম বিমলেশ্বর দেওয়ান ও ত্রিপুরা কান্ত চাকমাসহ ২০/২২ জন ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে কৃপাসুখ চাকমা ও আনন্দ বাঁশি চাকমা অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীরও ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষত বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে যে যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধে কোম্পানি কমান্ডার হিসাবে নেতৃত্ব দেন হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা। কোম্পানী কমান্ডার হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে **১৯৭১** সালের **১৩** আগস্ট তৎকালীন মহকুমা সদর রামগড়ের পাকিস্তানি বাহিনীর সদর দপ্তরে আক্রমণ করেন। তারা আবার **১০** সেপ্টেম্বর মানিকছড়ি উপজেলায় পাকিস্তানি বাহিনীর উপর আরেকটি গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করেন। হেমদারঞ্জন ত্রিপুরা এই মানিকছড়ি এলাকায় বেশ কয়েকবার পাকিস্তানি বাহিনীর উপর অভিযান চালান এবং একজন ক্যাপ্টেনসহ **১৩** জন পাকিস্তানি হানাদার সদস্যকে হত্যা করেন। মুক্তিযুদ্ধে রঞ্জিত ত্রিপুরা, রণবিক্রম ত্রিপুরাসহ ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর আরও অনেক লোক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বরেন ত্রিপুরা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে তঞ্চঙ্গা: ১৯৭১ সালে কালামন তঞ্চঙ্গা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বান্দরবানে শহিদ হন। বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ আরম্ভ হলে, পাকিস্তানি সৈন্য ও পাঞ্জাবি পাঠানদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ বাঙালি দেশ ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বহু নর-নারী ভারতের পূর্বাঞ্চল মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় লাভের লক্ষ্যে রাজস্থলি বান্দরবান, রাইংখ্যং বনাঞ্চল অতিক্রম করে। তঞ্চঙ্গারা এসব অসহায় শরণার্থীদের খাদ্য-দ্রব্য ও আশ্রয় দেন এবং তাদের পথ প্রদর্শন করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করে। উল্লেখ্য যে বান্দরবানের একজন প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান অনিল তঞ্চঙ্গা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে মারমা: কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলার বাসিন্দা সিংহামোং, আবিও, মংছিয়েন ও আক্যমং প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এদের মধ্যে মংছিয়েন শহিদ হন। কক্সবাজার ও পাহাড়ি এলাকার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে ৮ ডিসেম্বর শহিদ হন। তাঁকে মহেশখালি দ্বীপেই সমাহিত করা হয়। **১৯৭১** সালে তাঁর বয়স ছিল **২১** বছর।

মুক্তিযুদ্ধে মণিপুরীঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মণিপুরী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর মণিপুরী সমাজে আওয়ামী লীগের সমর্থক কর্মী-নেতারা দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী করণীয় সে বিষয়ে দলের উর্ধ্বতন নেতাকর্মীদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। তাছাড়া তৎকালীন মৌলভীবাজার মহকুমার (বর্তমানে জেলা) কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বড়লেখা, কুলাউড়া, সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, হবিগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) চুনারুঘাট প্রভৃতি মণিপুরী অধ্যুষিত এলাকায় মণিপুরীরা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করে এবং শরণার্থীদের নিরাপদে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যেতে সহায়তা করে।

ভানুবিল মণিপুরী গ্রামের সরকারি চাকুরে কৃষ্ণকুমার সিংহ বিয়ানীবাজার সীমান্ত পার হয়ে ভারত গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শ্রীমঙ্গল কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্র তিলকপুর গ্রামের সতীশচন্দ্র সিংহ শ্রীমঙ্গল শহরে পাকিস্তানিদের আস্তানা তৈরির পরদিনই ত্রিপুরায় পৌঁছে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নীলকান্ত সিংহ মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং হাকালুকি হাওরে পাকিস্তানি সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখেন। গিরীন্দ্র সিংহ মুক্তিবাহিনীর গাইড হিসাবে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং শহিদ হন। রবীন্দ্রকুমার সিংহ, এম সি কলেজের গণিত অনার্সের ছাত্র ছিলেন। তিনিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরকম অনেক মণিপুরী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শরণার্থী শিবিরে মণিপুরী গানের শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের গান গেয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধন সিংহ, অনিতা রানি প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধে খাসি : মুক্তিযুদ্ধে খাসিদের অবদান নিয়ে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। লোকমুখে জানা যায় যে, খাসিরা সীমান্ত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ ও খবরা-খবর আদান প্রদানে সাহায্য সহযোগিতা করত। তবে ইয়নিস খাসির মতো কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম সেরা নারী যোদ্ধাদের মধ্যে কাকন বিবি ছিলেন খাসি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ। তার প্রকৃত নাম কাকেউ নিয়তা।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালরা কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছিল?
কাজ- ২:	মণিপুরী শিল্পীদের মধ্যে শরণার্থী শিবিরে গান গেয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন কে কে?
কাজ- ৩:	রংপুর সেনানিবাস কারা আক্রমণ করেছিল? কে নেতৃত্ব দিয়েছিল?

পাঠ-৮ : মুক্তিযুদ্ধে কাকন বিবির বীরত্বপূর্ণ অবদান

দেখতে অনেকটা বাঙালির মতো হলেও কাকন বিবি ছিলেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ। তাই যুদ্ধের সময় এক পাকিস্তানি মেজর তাঁকে দেখেই বলেছিলেন, 'ওকে-তো দেখে বাঙালি মনে হয় না, মনে হয় অন্য জাত'। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙালি নন, খাসি নারী। এক খাসি পরিবারে জন্ম এই মহিয়সী নারীর। মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের দোয়ারাবাজারের কাকেট নামে এক মহিলার অবদানের কথা জানা যায়, তিনি সেই কাকন বিবি। এলাকায় তিনি পরিচিত 'খাসি মুক্তিবেটি' হিসাবে। অর্থাৎ জাতিগত পরিচয়ের বাইরে মানুষ হিসাবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এই উজ্জ্বল তাঁরার পরিচয় পেয়েছি আমরা অনেক পরে।

মাতৃসূত্রীয় খাসি পরিবারে জন্ম কাকনের। খাসি নাম কাকেউ নিয়তা। তিনি ১৯৪৮ সালে সুনামগঞ্জের সীমান্তের কাছে নওত্রই গ্রামে অবস্থাসম্পন্ন কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট কাকেউ। মাতৃগর্ভে তিনি হারান বাবাকে। আর দেড় বছর পরে মাকে হারিয়ে তাঁর আশ্রয় হয় নানীর কাছে। নানীর কাছ থেকে চলে আসেন বড় বোনের আশ্রয়ে। শৈশবে পিতা-মাতাকে হারিয়েছিলেন এবং সকলের ছোট বলেই ভাইবোনদের আদরটা তিনি বেশি পেয়েছেন। পরিবারে কোনো অভাব অনটন ছিল না। তাঁর বড় বোন কাপল নিয়তা আনসার বাহিনীতে কর্মরত এক মুসলমান কমান্ডারকে বিয়ে করেন। তিনি বড় বোনের সঙ্গেই কাতলবাড়ি থাকতে শুরু করেন। সেখানেই শৈশব এবং কৈশোরের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। হঠাৎ করেই বড় বোনের উৎসাহে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলিম হয়ে যান। তাঁর নতুন নাম হয় 'নুরজাহান'। এরপর আবার ফিরে আসেন সুনামগঞ্জে। বিয়ে করেন বাংলাবাজারের ছেলে শহীদউদ্দিনকে। পরপর কয়েকটি সন্তান মারা যাবার পর আরেকটি সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় তাঁকে তালাক দেয় শহীদউদ্দিন। পরবর্তীতে বোনের স্বামীর উদ্যোগে কাকন বিবি বোগলা ক্যাম্পের সীমান্ত রক্ষী পাকিস্তানের বাসিন্দা আব্দুল মজিদ খানকে বিয়ে করেন। এর কিছুদিন পরই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কাকন বিবির স্বামী অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে সিলেটের আকালিয়া ক্যাম্পে চলে গেলে কাকন বিবি বোগলা ক্যাম্পে একা হয়ে পড়েন। শুরু করেন স্বামীকে খোঁজা। খুঁজতে খুঁজতে একদিন কাকন বিবি ধরা পড়েন রাজাকারদের হাতে। রাজাকাররা তাঁকে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে টেংরা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে পাকিস্তানিরা তাঁকে মুক্তিবাহিনীর চর হিসাবে সন্দেহে করে আবারও অনেক নির্যাতন চালায়। অসহ্য শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণায় কাকন বিবি ভেবেছিলেন তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন না। ক্যাম্পের মেজর বললেন, "তুমি যদি তোমার সত্যিকারের পরিচয় বল তা হলে তুমি বেঁচে যাবে। কাকন বিবি তাকে জানান যে তার স্বামী পাকিস্তানি সৈন্য। তখন পাকিস্তানিরা তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করে এবং তাকে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা করে। কাকন বিবি প্রথমে ভয়ে ভয়ে রাজি হন। তারা কাকন বিবিকে একটি কাগজ দেয় এবং বলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ধরলে যেন এই কাগজ দেখায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ধরলে যেন কাগজের কথা না বলে। পাকিস্তান সেনাক্যাম্পে যাতায়াতের সুবাদে কাকন বিবি বাঙালি নারীদের উপর নির্যাতনের ভয়াবহতা দেখেন। তিনি মুক্তিবাহিনীর কাছে এসে সব খুলে বলেন এবং পাকিস্তানিদের সব খবর মুক্তিবাহিনীকে দেন। এভাবেই তিনি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা শুরু করেন। তিনি পাকিস্তানিদের গোলাবারুদ লুকিয়ে বের করে এনে নিজে নৌকা চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছে দিতেন। মহব্বতপুর যুদ্ধ, কান্দাগাঁয়ের যুদ্ধ, বসরাই

টেংরাটিলার যুদ্ধ, বেটিরগাঁও নুরপুরের যুদ্ধ, দোয়ারাবাজারের যুদ্ধ, টেবলাইয়ের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সুনামগঞ্জে যেদিন মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে কাকন বিবি সর্বক্ষণই মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল দক্ষিণদিয়ায়। জঙ্গলের মতো জায়গা সেটি। সেই ক্যাম্পের অবস্থান জেনে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি জড়ো করেন। তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রু ক্যাম্প দখল করার জন্য দুদিক থেকে আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধারা সিলেটের বারকাফন ব্রিজটি উড়িয়ে দেওয়ার সময় কাকন বিবি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া ছিল যুদ্ধ-কৌশলের একটি অন্যতম দিক। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে কাকন বিবি গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। অমানবিক অত্যাচার হয় তাঁর উপর। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এই বীরযোদ্ধা নারীর কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

অনুশীলন

কাজ- ১:	মুক্তিযোদ্ধা কাকন বিবির প্রকৃত নাম কী?
কাজ- ২:	মুক্তিযুদ্ধে নারী কাকন বিবি কী ভূমিকা রেখেছিলো?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. হাজং বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে?

ক. ভুপেন ভট্টাচার্য খ. কমরেড মনিসিংহ

গ. পঞ্চানন ঠাকুর ঘ. আলতাব আলী

২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুলত —

ক. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য

গ. নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ঘ. জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পারুল তার দাদুর কাছে শুনেছিল যে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলারাও পুরুষদের সাথে মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এক নারীকে পাকিস্তানিরা টেংরা ক্যাম্পে নির্যাতন করে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

৩. মুক্তিযোদ্ধা ঐ মহিলার নাম কী?

ক. কাকন বিবি খ. তারামন বিবি
গ. ছায়াদেবী ঘ. ফোরদৌসী বিবি

৪. দাদুর বর্ণিত নারীর নির্যাতনের কারণ-

i. স্বাধীনচেতা মনোভাব
ii. দেশের প্রতি ভালোবাসা
iii. পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ঘটনা-১ : ময়মনসিংহ এলাকার যুবক শিশির তার জমির মালিকের নির্দেশে জঙ্গল থেকে হাতি ধরে আনত। কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দেওয়ায় সে বিদ্রোহী হয়।

ঘটনা-২ : বান্দরবান এলাকার অমর তার উৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশ জমির মালিককে দিতে বাধ্য হয়। এতে সেও বিদ্রোহী হয়।

৫. ঘটনা-১ এ কোন বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে?

ক. হাজং ও গারো খ. ত্রিপুরা ও গারো
গ. মণিপুরী ও হাজং ঘ. গারো ও মণিপুরী

৬. অমর ও শিশিরের বিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-

i. কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠন করা
ii. ন্যায্য মজুরী আদায়
iii. সামন্ত প্রভুদের শোষণ থেকে মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. টিপু টিভিতে প্রামাণ্য চিত্র দেখছিল। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একটি দল এক বৃহৎ বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করছে। ঐ বৃহৎ শক্তি তাদের উৎপাদিত পণ্য নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। তাদের উপর এমন ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিত যা বংশপরম্পরায় চলতে থাকতো। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দুই ভাই প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের প্রতিবাদের মুখে ঐ বিদেশি শক্তি পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. ছপাতি নকমা কে ছিলেন?

খ. টংক প্রথা বলতে কী বোঝায়?

গ. টিপুর দেখা প্রামাণ্য চিত্রটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. টিপুর দেখা ঐ প্রামাণ্য চিত্রের দুই ভাইয়ের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২. সংগীতা সিনহা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপর একটি বই পড়েছিল। বই পড়ে সে জানে যে, বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরি করে। ঐ অঞ্চলটা ছিল জমিদারদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। জমিদারের গোমস্তা জনগণের কাছ থেকে রশিদ না দিয়ে খাজনা নেয় এবং পরে খাজনা বকেয়া দেখিয়ে তাদের জমি দখল করে। ঐ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করে নিজেদের অধিকার আদায় করে।

ক. তুলা বিদ্রোহ কী?

খ. বিরসা মুন্ডার পরিচয় দাও।

গ. সংগীতা সিনহার পঠিত বইয়ে যে বিদ্রোহের কথা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সংগীতার পঠিত আন্দোলনের সফলতার জন্য কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই প্রধান"–বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান

সকল সংস্কৃতির মানুষই তাদের নিজস্ব পরিবেশ সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সংস্কৃতিলব্ধ এ জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ স্থানীয় প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। মানুষের জীবনধারণের অভিজ্ঞতা থেকে লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞানের উৎপত্তি। জীবন ও প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা এসব সর্বজনীন চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নির্যাসই হলো লোকজ জ্ঞান। আবহমানকালের লোকজ জ্ঞানের ভাণ্ডার যথাযথ সংরক্ষণ ও চর্চার অভাবে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। অমূল্য এ জ্ঞানভাণ্ডার একটি জাতীয় সম্পদ। অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তিও আজ পর্যন্ত মানুষের জন্য চূড়ান্ত ভরসার জায়গা হয়ে উঠতে পারেনি। তাই প্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি লোকজ জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডারকেও দেশের স্বার্থে রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রতিদিনের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে লোকজ জ্ঞানের ব্যবহার ও চর্চা অব্যাহত আছে। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে জানব।

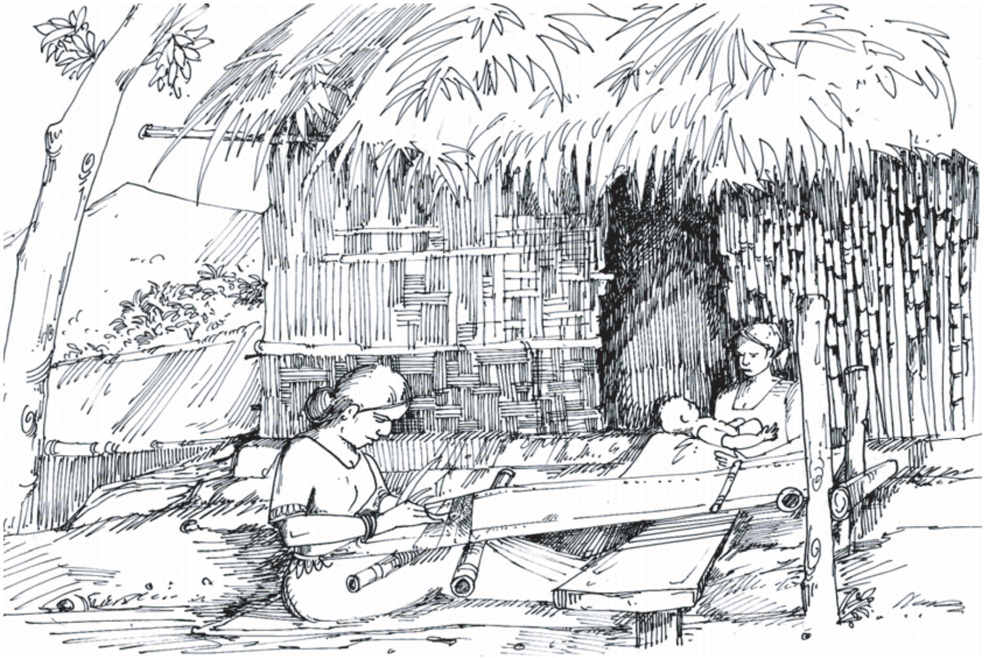

চিত্র- ৫.১: নিজেদের বানানো তাঁতে কাপড় বুনছে

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রবাদ-প্রবচনের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ;
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব ;
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজজীবনে লোকজ জ্ঞানের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং লোকজ জ্ঞানের প্রতি মর্যাদা দানের মনোভাব পোষণ করব।

পাঠ - ০১: লোকজ জ্ঞান

কোনো অঞ্চলে শত শত বছর বসবাস করে স্থানীয় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের উৎস, আহরণের উপায় ও প্রস্তুত করার কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এভাবেই তারা তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আবাসস্থল নির্মাণ করে কিংবা তার চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন ধারণ করে। এসব বিষয়ে সকল সংস্কৃতির মানুষেরই রয়েছে নিজস্ব স্থানীয় জ্ঞান। কৃষিকাজ, স্বাস্থ্যরক্ষা, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বহুবিধ কাজে এ ধরনের লোকজ বা আঞ্চলিক জ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে সকল সংস্কৃতির মানুষই তাদের নিজস্ব পরিবেশ সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সংস্কৃতিলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ স্থানীয় প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। নিজস্ব বসবাস অঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিলব্ধ জ্ঞান হলো লোকজ জ্ঞান।

মানুষের জীবনধারণের অভিজ্ঞতা থেকে লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞানের উৎপত্তি। এই জ্ঞানের উৎস কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান নয়। বরং সাধারণ মানুষের আলোচনার মাধ্যমে বা মুখে মুখে লোকজ জ্ঞান বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। এসকল লোকজ জ্ঞান সাধারণত কোনো বই বা গ্রন্থে সবসময় মুদ্রিত থাকে না। লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞান তাই নির্দিষ্ট অঞ্চল ও সংস্কৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকে। লোকজ জ্ঞান হলো নির্দিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতিতে গড়ে উঠা স্থানীয় পর্যায়ের জ্ঞান যা ঐ সমাজ-সংস্কৃতির অনন্য ঐতিহ্য। আমাদেব.দেশে কৃষকের বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক চাষাবাদ সম্পর্কিত পৃথক পৃথক জ্ঞানকে লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞান বলা যেতে পারে। কৃষক জানেন যে কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করতে হয়, কীভাবে বীজতলা করলে ভালো চারা উৎপন্ন হয়, কোন জমিতে কোন ধরনের ফসল ভালো হয়, কখন সার দিতে হয় ইত্যাদি। একইভাবে আকাশে মেঘের অবস্থান ও রং দেখে গ্রামের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। এগুলো সবই লোকজ বা স্থানীয় জ্ঞানের উদাহরণ। লোকজ জ্ঞানের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যথা:

- এটি অঞ্চল ও সংস্কৃতিভেদে নির্দিষ্ট।
- জীবনধারণ ও প্রতিনিয়ত টিকে থাকার জন্য এই জ্ঞান অপরিহার্য।
- এই জ্ঞান বই-পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা লিপিবদ্ধ নয়।
- এই জ্ঞানের প্রসার ও প্রবাহ হয় সাধারণত মৌখিক, কথ্য রীতি বা আলোচনার মধ্য দিয়ে।
- মানুষের অভিজ্ঞতা, খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন, পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করেই এই জ্ঞান সৃষ্টি হয়।

লোকজ জ্ঞান এবং আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

লোকজ জ্ঞান	আধুনিক জ্ঞান
লোকজ জ্ঞান সাধারণত মানুষের মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়।	আধুনিক জ্ঞান হলো লিখিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে আধুনিক জ্ঞান শেখানো হয়।
দৈনন্দিন কাজকর্ম আর কাজের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে লোকজ জ্ঞান অর্জিত হয়।	আধুনিক জ্ঞান বিশ্লেষণমূলক। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে আধুনিক জ্ঞান আহরণ করা হয়।
সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত এই জ্ঞান অনুসারে প্রকৃতির সকল উপাদান আন্তসম্পর্কীয়। তাই লোকজ জ্ঞান সামগ্রিক এবং আলাদা বা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত নয়।	আধুনিক জ্ঞান বিভিন্ন শাখা- প্রশাখা বা ধারা-উপধারায় বিভক্ত। যেমন: বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা।

বর্তমানে আধুনিক জ্ঞান প্রসারের কারণে এই লোকজ জ্ঞান নানা ভাবে অবহেলিত করেছে। আমরা খুব সহজে ভুলে যাই যে এই লোকজ জ্ঞান ও কৌশল দ্বারাই শত শত বছর ধরে মানুষ তার প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বসবাস করে আসছে। যেহেতু লোকজ জ্ঞান মানুষের বেঁচে থাকার সাথে সম্পর্কিত, স্থানীয় পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ এই জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও জীবনধারণ করে। উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষেত্র হলো: (১) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, (২) স্বাস্থ্য, (৩) শিক্ষা, (৪) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও (৫) সমাজ ভিত্তিক অন্যান্য কার্যক্রম।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	লোকজ জ্ঞান বলতে কী বোঝায়? লোকজ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।
কাজ- ২:	লোকজ জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের পার্থক্য লেখ।

পাঠ- ০২ ও ০৩: প্রবাদ-প্রবচনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কিছু প্রবাদ প্রবচন আছে। লোকজ জ্ঞানের আধার এসব প্রবাদ-প্রবচন তারা দীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। এগুলো মূলত মৌখিক সাহিত্য এবং লোক সাহিত্যের প্রধান শাখা। একটি জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা ও লোকজ্ঞানের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রবাদ-প্রবচনে। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতাকে মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয়। যা থেকে অন্যরা শিক্ষা লাভ করতে পারে। এমনকি শিক্ষিত মানুষেরও এ থেকে অনেক কিছু শেখার ও জানার আছে। এসব প্রবাদ-প্রবচন ঠিক কবে, কখন, কোথায় সৃষ্টি হয়েছিল তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে প্রবাদ-প্রবচনের অন্যতম গুণ হচ্ছে এর সর্বজনীনতা। এর মধ্যে যেমন সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে, তেমনি কৌতুক বা হাস্যরসেরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রবাদ প্রবচনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

রয়েছে। যেমন-

ক. হাজার বছরের অভিজ্ঞতা, পরিণত লোকজ্ঞান এবং প্রজ্ঞা।

খ. মূল্যবোধ এবং নীতিবাক্য প্রকাশিত হয়।

গ. সকলের কাছে গ্রহণীয় ও সকলের মাঝে প্রচলিত।

ঘ. সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজ বাক্যে বা ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশিত।

ঙ. নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য বহন করে।

চ. অলংকারিক ভাষায় প্রকাশিত হয় (উপমা, বিরোধাভাস প্রভৃতি)।

অন্যান্য জাতির মতোই বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝেও প্রচলিত রয়েছে নিজস্ব কিছু ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচন। তবে এর অনেক কিছুই লিখিত না থাকায় সেগুলো আজ আর তেমন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু প্রবাদ-প্রবচন এবং তার বাংলা মর্মার্থ উল্লেখ করা হলো:

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	প্রবাদ-প্রবচন	বাংলা তর্জমা	ভাবার্থ / বাংলা প্রবাদ
চাক	দুঃখা আহান্নে ছুকখালুদে।	কষ্ট করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।	বাংলা ভাষাতেও অনুরূপ একটি প্রবচন চালু আছে। সেটি হলো -'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে'।
পাংখোয়া	ল এক হ্লাউ।	দলের মধ্যে একজন খারাপ হলে সকলেরই দুর্নাম হয়।	
ম্রো	ভাসাই ওয়াককই পের টাই টায়া ফুল দৈ।	মরা হাতির দেহ কুলা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।	সত্য কখনো গোপন থাকে না।
মৈতৈ	অবিক পসি মরল মুন্না চায়।	কৃপণ লোকের ধন সম্পদ ঘুন পোকায় খায়।	সম্পদের সদ্ব্যবহার না করে সেগুলোকে অযথা আঁকড়ে ধরে থাকা ঠিক নয়। কারণ এতে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় এবং অবশেষে কোনো কাজে আসে না।
বিষ্ণুপ্রিয়া	অকনেইর জতা ছিড়ইন।		অদক্ষ লোক দ্বারা কাজ করালে অযথা পরিশ্রম আর বিশৃঙ্খলা হয়।
হাজং	দিনুনি আশা, রাতিনি গাসা।	দিন হচ্ছে কাজের জন্য আর রাত হচ্ছে বিশ্রামের।	ভালো কাজ করার জন্য উদ্যমের প্রয়োজন, আর তা দিনেই করা উচিত।
খাসি	উ বাম হাতি কিত কুলাই।	হাতির মতো খাও আর ঘোড়ার মতো দৌড়াও (কাজ কর)।	পেটে না দিলে পিঠে সয় না

মান্দি	সংঅ প্রাপ, পাংসা, নিগামো মাংসা মাংসা, মান্দে রাসং গ্নাংঅ।	বৃক্ষের সেরা বুড়ো বট, জীবের বৃহৎ ঐরাবত।	ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই আসল মানুষ।
খুমী	সিখি ডিই লেখা সেউঙা বাই।	হরিণ শিকারের আগে কলাপাতা মাটিতে বিছানো।	মরার আগে ভূত হওয়া।
মারমা	খরুহ্ মতইকে অমুই ম্‌খ।	হোঁচট না খেলে কেউ মাকে ডাকে না।	বিপদে পড়লে তবে মানুষ আপন জনকে খোঁজে।
ত্রিপুরা	'লাইয় বুসু কালাই খাই লাইসে পাগ', 'বুসুগ' লাই কালাই খাই হেই লাইসে পাগ'।	কাটা পাতার উপর কাঁটা পড়লে পাতা ছিঁড়ে যায়, আবার কাঁটার উপর পাতা পড়লেও পাতা ছিঁড়ে যায়।	সবল দুর্বলের উপর পড়লে যা হয় দুর্বল সবলের উপর পড়লেও তাই। মরার উপর খাঁড়ার ঘা
ওরাঁও	ঘারসে নিকেলকে কোনহ্ কামনে যারেক সময় খালি খাইল্যা দেখলে বরাত খারাপ।	ঘর থেকে বের হয়ে কোনো কাজে যাওয়ার সময় খালি কলস দেখলে যাত্রা অশুভ।	
সাঁওতাল	পুথি খন্ তুথিগে সরসা, ধরম্ খন্ করম্‌গে লাট গেয়া।	পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, ধর্ম অপেক্ষা কর্ম ভালো।	
চাকমা	ভাত মিজাল্যা খা-দে সুখ, মানুচ মিজাল্যা চা-দে সুখ।	মিশ্র চালের ভাত খেতে মজা, আর মিশ্র বর্ণের (নানা জাতি-বর্ণের) মানুষকে দেখতে পাওয়া সুখকর।	বৈচিত্র্য না থাকলে যে কোনো জিনিস একঘেয়ে ও বিরক্তিকর মনে হয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রবাদ-প্রবচন কি লোকজ জ্ঞান? প্রবাদ-প্রবচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
কাজ- ২:	যে কোনো তিনটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রবাদ-প্রবচনের ভাবার্থ বিশ্লেষণ কর।

পাঠ- ০৪ ও ০৫: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ চিকিৎসা জ্ঞান

আদিকাল থেকেই মানুষ স্বাস্থ্য সমস্যা ও রোগব্যাধিকে জয় করার চেষ্টা করছে। যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে রোগের ধরন ও প্রকোপ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত ও আধুনিক হয়ে উঠেছে চিকিৎসা পদ্ধতিও। তবে আধুনিক যুগে নানা ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আগে মানুষকে রোগের চিকিৎসার জন্য লোকজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হতো। তারা বনের লতাগুল্ম, গাছ-গাছালির ছাল, পাতা ও ফলমূল, শেকড়-বাকড়, খনিজ দ্রব্যাদি, কীট-পতঙ্গ এবং নিজেদের ঘরে তৈরি পানীয় বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করতো। কোনো গাছের বা দ্রব্যের কী ঔষধি গুণ আছে এবং কোন অসুখে তা ব্যবহার করতে হবে সেটি তারা ভালোভাবে জানতো। কারণ প্রাকৃতিক বা ভেষজ ঔষধের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের রয়েছে হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এবং লোকজ চিকিৎসা জ্ঞান।

আধুনিক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। চিকিৎসা পদ্ধতি সহজ ও উন্নত হয়েছে। আবার দেখা গেছে মানব দেহের উপর আধুনিক কিছু ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাবও রয়েছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক চিকিৎসা সেবা অনেকাংশে ব্যয়বহুল। আবার আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কিংবা প্রত্যন্ত এলাকায় আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ এখনও সীমিত। তাই ঐসব অঞ্চলের মানুষকে তাদের স্থানীয় ও লোকজ চিকিৎসা সেবার উপর অধিক নির্ভর করতে হয়। লোকজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত উপকরণগুলো সহজলভ্য অর্থাৎ স্থানীয় পরিবেশ থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যায়। লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতির ভিত্তি হলো বিভিন্ন ঔষধি গাছ ও প্রাকৃতিক উপাদানের চিকিৎসা গুণ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে এ বিষয়ে হাজার বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতির জনপ্রিয়তার কিছু মৌলিক কারণ রয়েছে, যেমন (১) দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কারণে এর সফলতা সম্পর্কে মানুষের আস্থা, (২) লোকজ চিকিৎসা সেবা ও জ্ঞান হলো স্থানীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, (৩) স্থানীয়ভাবে সহজেই ও স্বল্পমূল্যে লোকজ চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়, (৪) আধুনিক চিকিৎসা সেবা স্থানীয়ভাবে কিংবা সবার জন্য সহজলভ্য নয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে নিজেদের তৈরি ঔষধ দিয়ে সফলতার সাথে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয় যথা জ্বর, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, জন্ডিস, সরীসৃপ ও অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, বাত, বদহজম, ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, পাইলস, নানা চর্মরোগ, খুসকি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, ডায়াবেটিস, দন্তরোগ, কাঁটাছেঁড়া, মচকানো বা ভাঙা হাড়ের চিকিৎসা প্রভৃতি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত চিকিৎসা সেবার একটি হলো লোকজ জ্ঞাননির্ভর ধাত্রীবিদ্যা। শিশুর জন্মের সময় নিবিড় তদারকি এবং নবজাতক ও প্রসূতি মাকে সেবা দানের জন্য তাদের সমাজে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের কোনো সুযোগ হয়তো তাদের অনেকের জীবনে ঘটেনি। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিই তাদের আদর্শ শিক্ষক। তারা সাধারণত হয়ে থাকেন বয়স্ক নারী এবং তাদের একটি নির্দিষ্ট পদবিও থাকে। যেমন - চাকমা সমাজে ধাত্রীবিদ্যার কাজ যারা করেন তারা 'ওঝা' নামে পরিচিত। মণিপুরী সমাজে তাদেরকে ডাকা হয় 'মাইবি' নামে। এছাড়াও রয়েছেন বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রতিকার সম্পর্কে প্রাচীন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ স্থানীয় কবিরাজগণ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ও গবেষণার মাধ্যমে লোকজ চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটানো গেলে দেশের জন্য তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

নিচে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কয়েকটি চিকিৎসা প্রণালি উল্লেখ করা হলো

রোগের নাম	ঔষধ তৈরির বনজ উপকরণ	প্রস্তুত প্রণালি ও ব্যবহার
জন্ডিস	(১) মোরমোচ্যা আমিল্যা (লতা জাতীয় এক ধরনের টক পাতা যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে পাওয়া যায়)। (২) মোগোই কাঙাড়া (আকারে খুব ছোট এক ধরনের কাঁকড়া যা পার্বত্য চট্টগ্রামের নদী ও ঝরণার জলে পাওয়া যায়। কাঁকড়াটি দেখতে ধূসর বর্ণের)।	প্রথমে দুইটি উপকরণ ভালোভাবে ধূয়ে বেছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর পরিমাণ মতো লবণ ও পানি মিশিয়ে সেগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ করতে হবে। এসময় কাঠি দিয়ে নেড়ে ফুটন্ত উপকরণগুলো একসাথে গুলিয়ে নিয়ে স্যুপ তৈরি করতে হবে। স্যুপটা কুসুম গরম অবস্থায় দিনে কয়েকবার খেতে হবে।
বাচ্চাদের সর্দি-কাশি	থোরা গাছের মূল ও পাতা, কুরা চিত শাক এবং লোহার জারণ।	উপকরণগুলো একসঙ্গে বেটে রস আগুনে পোড়ানো লাল লোহার সেঁকা দিয়ে গরম করে নিতে হবে। এরপর প্রতি বার ১/২ ছটাক পরিমাণ সেবন করতে হবে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ চিকিৎসা জ্ঞান কেন গুরুত্বপূর্ণ? নিজের মতামত দাও।
কাজ- ২:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে ভেষজ ঔষধ তৈরির জন্য সাধারণত কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়?

পাঠ- ০৬: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ কৃষি জ্ঞান

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ, জুমচাষ ও উদ্যানচাষের উপর নির্ভরশীল। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ পাহাড়ে জুমচাষ ও সমতলে চাষাবাদ – দুটোতেই অভ্যস্ত। তবে যারা পাহাড়চূড়ায় বসবাস পছন্দ করে,জুমচাষ তাদের প্রধান জীবিকা। আর যারা পাহাড়ের পাদদেশ কিংবা সমতল অঞ্চলে বাস করে তাদের কাছে জুমচাষ ও হালকৃষি দুটোই সমান পরিচিত। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া, ম্রো, বম, লুসাই প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকালয়গুলো মূলত উঁচু পাহাড়শ্রেণির ঢালে বা চূড়ায় হয়ে থাকে বলে তারা জুম চাষে অভ্যস্থ । আর অন্য দিকে যারা অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড়, সমতল কিংবা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করে যেমন রাখাইন, চাকমা, মারমা, মান্দি, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠী জুমচাষ ও হাল কৃষি -দুটিতেই অভ্যস্থ। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর জীবিকা নির্বাহের সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে। সুতরাং যেসব অঞ্চলে তারা এখন বসবাস করছে সেখানকার ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী তাদের চাষাবাদের ধরন নির্ধারিত হয়।

চাষাবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ যুগ যুগ ধরে তাদের লোকজ জ্ঞান প্রয়োগ করে আসছে। কীটনাশকমুক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনে তাদের এই লোকজ জ্ঞানের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। যেমন– পাহাড়ে যে জুমচাষ হয় তাতে শিল্পকারখানায় উৎপাদিত কোনো প্রকার সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত নিজেদের তৈরি জৈবসার ও পোকামাকড় দমনের নিজস্ব পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করে থাকে। সমতল অঞ্চলে হালচাষের ক্ষেত্রেও তারা কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করার রীতি মেনে চলে। জুমচাষে যে ধান বা শস্যবীজ ব্যবহার করা হয় সেগুলো একেবারেই অকৃত্রিম দেশজ উপকরণ যা শত শত বছর ধরে এবং বংশ পরম্পরায় এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে আসছে।

চাষাবাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে হাজার বছরের লোকজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রভাব। একই জুমখেতে একযোগে বিভিন্ন ফসলের ফলন কীভাবে পাওয়া যায়, পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে কীভাবে সেই ফসল পর্যায়ক্রমে সারা বছর কাজে লাগানো যায় তা তারা জানে। ফসলের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য যাতে রক্ষা পায় তার জন্য তারা কিছু নিয়ম ও সংস্কারও মেনে চলে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু এলাকা বা বনভূমি আছে যেখানে তারা জুমচাষ করে না। তাদের ধারণা ঐসব স্থানে জুমচাষ অমঙ্গল বয়ে আনবে। সাপের গর্ত, বাদুরের পুরনো আস্তানা বা পাহাড়গুলোর বিশেষ আড়াআড়ি অবস্থান প্রভৃতি দেখে সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝতে পারেন কোন কোন এলাকায় জুমচাষ এড়িয়ে চলতে হবে। এছাড়া জুমচাষিরা বড় এবং বিশেষ ধরনের উপকারী গাছ গাছালি, বাঁশের মূল এবং বিশেষ কিছু পশু-পাখি ও কীট পতঙ্গকে সযত্নে রক্ষা করে চলে। কোনো স্থানে একবার জুমচাষ করার পর তা তারা চার পাঁচ বছর ধরে অনাবাদি ফেলে রাখে জমির উর্বরতা শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য। এসবই তাদের হাজার বছরের লোকজ জ্ঞানের আবিষ্কার যা তারা পরিবার ও প্রকৃতি থেকে শিখেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এখন ব্যাপক আলোচনা চলছে। সমস্যা হলো, এসব উন্নয়ন আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের হাজার বছরের লোকজ জ্ঞানকে উপেক্ষা করা হয়। ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। জুমচাষের ভালোমন্দ বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। দেশের পাহাড় ও বনাঞ্চলে নানা কারণে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞার ফলে এখন জুমচাষের পরিমাণ অনেক কমে এসেছে। সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা এবং বনাঞ্চল দখলের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় জুমচাষের প্রচলিত নিয়মও সর্বদা মানা হচ্ছে না। ফলে চাষিরা জুমচাষ থেকে আশানুরূপ সুফল পাচ্ছে না।

আমাদের দেশে সুন্দরবন ছাড়াও চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধুপুরে পাহাড় ও বনাঞ্চল রয়েছে। এই বনাঞ্চল ও পাহাড় আমাদের জাতীয় সম্পদ। এসব বন ও জীববৈচিত্র্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞানকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। বন ও প্রকৃতির কোলে যাদের বসবাস তারা জানে কীভাবে নিজের আশ্রয়স্থলকে সযত্নে রক্ষা ও পরিচর্যা করতে হয়। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

থেকে রক্ষা পেতে হলে পাহাড়, বন, নদী, সমুদ্র, জলাশয়সহ আমাদের প্রকৃতিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও দূষণমুক্ত রাখার কোনো বিকল্প নেই। তাই দেশের প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য ও স্থানীয় প্রকৃতিবান্ধব মিশ্র চাষাবাদ পদ্ধতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে।

অনুশীলন	
কাজ- ১ঃ	জুমচাষ কী ধরনের কৃষি পদ্ধতি? জুমচাষে লোকজ জ্ঞান ব্যবহারের কিছু উদাহরণ তুলে ধর।
কাজ- ২ঃ	প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞানকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে? তোমার মতামত দাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১. বিষমুক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোন বিশেষ জ্ঞান অধিক ভূমিকা রাখে?

ক. ধর্মবিশ্বাস　　খ. লোকজ জ্ঞান

গ. জাদুবিদ্যা　　ঘ. প্রযুক্তিজ্ঞান

২. লোকজ জ্ঞান হলো নিজস্ব-

i. বসবাস অঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে জানা

ii. পরিবেশ সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞান লাভ

iii. ব্যবহার্য জিনিসপত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

জমেলার বাগানে হরীতকী, নিম ও অড়হর গাছ আছে। সে ছেলে-মেয়েদের ছোট ছোট অসুখে এ ঔষধি গাছ ব্যবহার করে। জমেলার ন্যায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করে আসছে।

৩. জমেলা কোন পদ্ধতির চিকিৎসা গ্রহণ করছে?

ক. লোকজ　　খ. এলোপ্যাথিক

গ. কবিরাজি　　ঘ. হোমিওপ্যাথিক

৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা এ পদ্ধতিতে নির্ভরশীল হওয়ার কারণ-

i. আধুনিক চিকিৎসার স্বল্পতা

ii. এ পদ্ধতি অধিক কার্যকর মনে করা

iii. আদি পুরুষের চিকিৎসা বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. অনুপম চাকমা একই জমিতে একসাথে ধান, কুমড়া এবং পেঁপের চাষ করেন। তিনি জমিতে লতা-পাতা পঁচিয়ে তা সার হিসাবে প্রয়োগ করেন। পর্যায়ক্রমে ফসল উত্তোলনের পর তিনি অন্য অনাবাদি জমিতে চাষাবাদে মনোনিবেশ করেন।

ক. মাইবী কী?

খ. লোকজ জ্ঞানের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুপম চাকমার চাষ পদ্ধতির ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুপম চাকমার চাষপদ্ধতি কি পরিবেশ বান্ধব? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২০১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

বর্তমান বিশ্বের প্রধান সমস্যা পরিবেশ বিপর্যয় ও ক্রমহ্রাসমান জীববৈচিত্র্য। নানা প্রজাতির পশু-পাখি, সরীসৃপ এবং অন্যান্য প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে আর দ্রুত গতিতে আমাদের চিরচেনা জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবীর জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন। স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে জীবন যাপন করে আসছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ে তাদের রয়েছে বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বা লোকজ জ্ঞান। এই অধ্যায়ে আমরা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হব।

চিত্র- ৬.১: পাহাড়িয়া অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- জীববৈচিত্র্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব ;
- জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারব ;
- স্থানীয়ভাবে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধান এবং প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব ;
- জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী হব ;

পাঠ - ০১: জীববৈচিত্র্য

পৃথিবীতে বহুকাল আগে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। এরপর থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। নানা প্রকারের এবং নানা শারীরিক গঠনের সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়েই এই পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য। বিভিন্ন পরিবেশে নানা প্রজাতির জীবের যে মিলিত বসবাস বা বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ এবং সম্মিলিত জীবনধারণ প্রক্রিয়াই হলো জীববৈচিত্র্য। পৃথিবীতে যে প্রাণের মেলা আমরা দেখি তার মূল ভিত্তি জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্য না থাকলে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকতো না। জীববৈচিত্র্য আছে বলে আমরা জীবনধারণের জন্য সকল উপকরণই যেমন, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, খাদ্য, জ্বালানি, পানি, জীবনধারণের উপযোগী মাটি, আশ্রয়স্থল, ঔষধপত্র বা ঔষধ তৈরির উপকরণ প্রকৃতি থেকেই পেয়ে থাকি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমরা আনন্দ লাভ করি। বৃক্ষের ছায়া ও মনোরম আবহাওয়া আমরা উপভোগ করি। এসব উপাদান মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

উদ্ভিদ, পশুপাখি, অণুজীব এবং তাদের বংশধারা ও অসংখ্য প্রজাতি নিয়ে আমাদের জীববৈচিত্র্য। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ঘিরে আছে মাটি, গ্যাসীয় স্তর ও বায়ুমণ্ডল, পানি, বরফ, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি। এসব উপাদান একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে একটি বাসপোযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই পরিবেশ মানুষ ও উদ্ভিদসহ অন্যান্য প্রাণীকে বেঁচে থাকার জন্য শক্তি যোগায়। বিজ্ঞানীদের মতে, জীবজগতে প্রাণীর যেসব প্রজাতি রয়েছে তাদের সংখ্যা আনুমানিক তিন কোটি। জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের বর্ণনা অনুসারে পৃথিবীতে শুধু সতের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রজাতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। জীবজগতের বৈচিত্র্যের বড় অংশই এখনও আমাদের অজানা রয়েছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝানো হয়?
কাজ- ২:	পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি ধারণা দাও। পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে?

পাঠ - ০২: জীববৈচিত্র্যের ধরন ও প্রকারভেদ

সাধারণভাবে বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য বলতে আমরা পথিবীর সকল প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী এবং তাদেরকে ঘিরে থাকা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সমষ্টিকে বুঝে থাকি। একইভাবে, কোনো অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য বলতে আমরা বুঝি সেই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতি, বংশধারা ও প্রতিবেশ-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য। তাই সুস্পষ্টভাবে জীববৈচিত্র্য বলতে তিন ধরনের জীববৈচিত্র্যকে বোঝায়। সেগুলো হলো: (১) জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য, (২) প্রতিবেশ-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য ও (৩) বংশগতির বৈচিত্র্য।

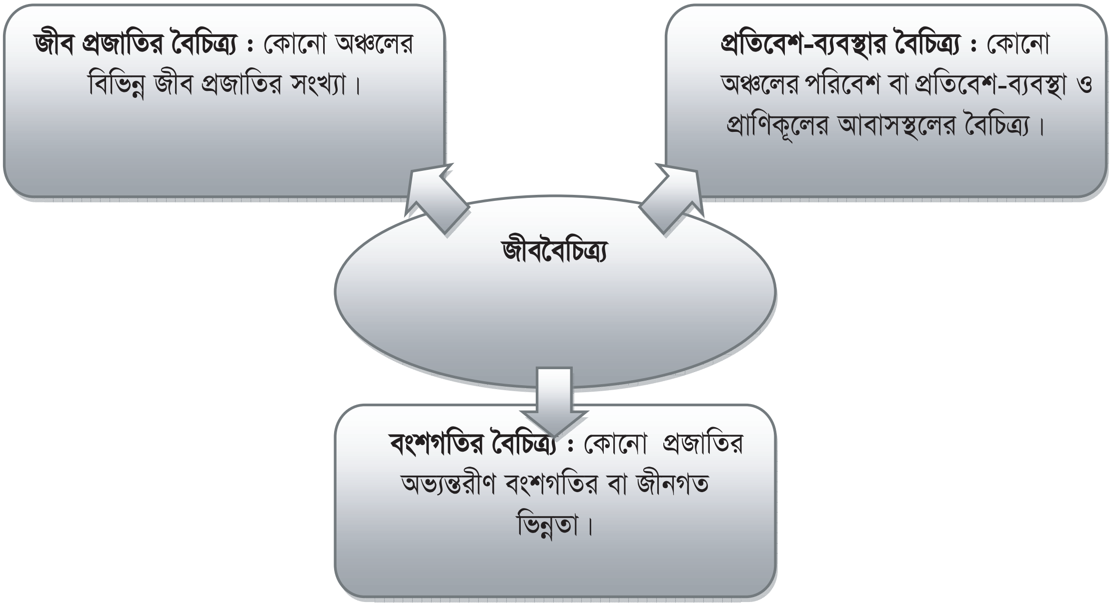

চিত্র- ৬.২ : জীববৈচিত্র্যের ধরন ও প্রকারভেদ

(১) জীব প্রজাতির বৈচিত্র্যঃ কোনো অঞ্চলের সকল জীব অর্থাৎ প্রাণী, গাছপালা, অনুজীব ইত্যাদির মধ্যকার ভিন্নতা দেখা যায়। এইসব ভিন্ন প্রজাতি গণনা করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সংখ্যা দ্বারা জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য পরিমাপ করা যায়।

(২) প্রতিবেশ-ব্যবস্থার বৈচিত্র্যঃ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জীব প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক এবং তার পাশাপাশি পরিবেশের জড় উপাদানগুলোর সাথে এদের নিবিড় ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে বলা হয় প্রতিবেশ-ব্যবস্থা। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবেশের সকল জীব ও জড় উপাদানের যোগসূত্র নিয়ে প্রতিবেশ-ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট কিছু জীব প্রজাতির বসবাসের অনুকূল। নিজ নিজ জীবনধারণের জন্য এসকল জীব প্রজাতি পরস্পরের উপর যেমন নির্ভর করে তেমনিভাবে ঐ ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের জড় পরিবেশের উপরও তারা নির্ভরশীল। এভাবেই গড়ে উঠে একটি প্রতিবেশ-ব্যবস্থা। প্রতিবেশ-ব্যবস্থা কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন: (ক) মরুভূমির প্রতিবেশ-ব্যবস্থা, (খ) বনাঞ্চলের প্রতিবেশ-ব্যবস্থা, (গ) সমুদ্রাঞ্চলের জলজ প্রতিবেশ-ব্যবস্থা, (ঘ) সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিবেশ-ব্যবস্থা এবং (ঙ) বৃষ্টিপ্রধান গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলের প্রতিবেশ-ব্যবস্থা।

(৩) বংশগতির বৈচিত্র্যঃ সাধারণত জিন বা বংশগতির বৈচিত্র্য বলতে জীবজগতের যে কোনো একটি প্রজাতির নিজস্ব বৈচিত্র্যকে বোঝায়। প্রতিটি জীবের বাহ্যিক গড়ন নির্ভর করে ঐ জীবের শারীরিক কোষের অভ্যন্তরের ডি.এন.এ বা জিনলিপির উপর। একইভাবে, জিনলিপির বৈচিত্র্যের কারণে জীবজগতের

প্রতিটি প্রজাতির অভ্যন্তরেও ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমনকি মানুষেরও কোষের ভিতরে অবস্থিত জিনলিপির বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করেই আমাদের প্রত্যেকের চেহারা ও আকৃতি আলাদা। ফলে বর্তমান পৃথিবীতেও কতো বিচিত্র চেহারা, গায়ের রং, উচ্চতা কিংবা আকৃতির মানুষ দেখা যায়। সুতরাং, বংশগতির বৈচিত্র্য বলতে মানুষসহ জীবজগতের প্রতিটি প্রজাতির অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যকে বোঝানো হয়।

অনুশীলন

কাজ- ১:	জীববৈচিত্র্যের ধরন আলোচনা কর।
কাজ- ২:	বংশগতির বৈচিত্র্য কী?

পাঠ- ০৩: পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের মধ্যে সম্পর্ক

চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। জীবজগৎকে ঘিরে সব ধরনের সজীব ও নির্জীব বস্তুর সমষ্টি হলো এই প্রাকৃতিক পরিবেশ। জৈব এবং অজৈব সব উপাদান পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। জৈব উপাদান হলো মানুষ, গাছপালা, অণুজীবসহ সকল প্রজাতির প্রাণী। আর অজৈব উপাদান হলো পানি, মাটি, বায়ু, সূর্যালোক, বরফ, গ্যাসীয় বলয়, খনিজ সম্পদ, আবহাওয়া প্রভৃতি। এসব উপাদান মিলেই আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ।

পৃথিবীর সকল উপাদান পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত। একইসাথে প্রতিটি উপাদানই অন্য অংশগুলোর উপর নির্ভরশীল। তাই পরিবেশের একটি উপাদানে কোনো পরিবর্তন হলে তার প্রভাব অন্য উপাদানেও পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশের ভিতরে কোনো ঘটনাই একক বা আলাদাভাবে ঘটে না। সকল উপাদানের সমন্বয়ে পরিবেশ একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। এই পরিবেশ ব্যবস্থারই একটি অংশ হলো আমাদের মানবজাতি। জীবজগতের সকল সদস্যই বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাণীর সমাবেশই হলো জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্য পরিবেশের অপরিহার্য অংশ। পরিবেশের সাথে জীববৈচিত্র্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এছাড়া মানব জাতিসহ সকল প্রাণীর একে অপরের উপর নির্ভরশীলতাও জীববৈচিত্র্যের অংশ। প্রাণিকুল একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে তোলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বা পরিবেশ। জীববৈচিত্র্য ছাড়া সবুজ, সুন্দর প্রকৃতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়া যেমন জীববৈচিত্র্য টিকে থাকে না তেমনি জীববৈচিত্র্য ছাড়াও পরিবেশ অসম্পূর্ণ। এদের উভয়েই একে অপরের পরিপূরক।

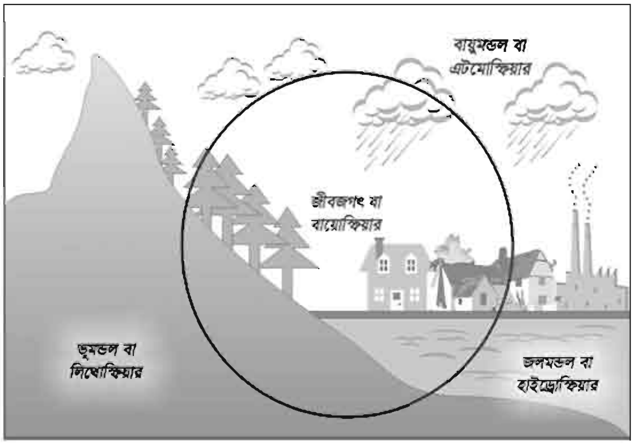

চিত্র- ৬.৩ : জীবজগতের সাথে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের সম্পর্ক

অনুশীলন	
কাজ- ১:	জীব জগৎ কী?
কাজ- ২:	পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? পরিবেশ কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত?

পাঠ- ০৪ ও ০৫ : বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

আয়তনে একটি ছোট দেশ হলেও বাংলাদেশে ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশে যথেষ্ট বৈচিত্র্য বিদ্যমান। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত শ্রেণি এবং দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমারের পাহাড়ের শাখা বিস্তৃত। এই সব পাহাড়ি এলাকা উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এবং এই স্থানগুলোকে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের তিনটি ধরন এখানে আলোচনা করা হলো, যথা: (১) জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য, (২) প্রতিবেশ-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য ও (৩) বংশগতির বৈচিত্র্য।

(১) জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য: বাংলাদেশে প্রায় ৫,৭০০ প্রজাতির স্থল উদ্ভিদ, ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৬২৮ প্রজাতির পাখি, ১২৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ২২ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ৭০৮ প্রজাতির মাছ, ২৪৯৩ প্রজাতির পোকামাকড়, ১৯ প্রজাতির অণুজীব, ১৬৪ প্রজাতির শৈবালসহ নাম না জানা আরও অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীব রয়ে গেছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, আমরা গত এক শতাব্দীর মধ্যে উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় ১০ শতাংশ এবং ১২ থেকে ১৮ প্রজাতির বন্যপ্রাণী চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি। এছাড়া ৪০ প্রজাতির স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৪১ প্রজাতির পাখি, ৫৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ১০৬ থেকে ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ আজ বিলুপ্তির হুমকির মুখে রয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশের জীব প্রজাতির বৈচিত্র্যে যুক্ত হয়েছে বহু বহিরাগত জীব প্রজাতি। যেমন: উদ্ভিদের মধ্যে অন্যতম একটি প্রজাতি হচ্ছে কচুরিপানা যা কিনা বহিরাগত একটি উদ্ভিদ প্রজাতি। অথচ এখন আমাদের দেশে ডোবা, পুকুর থেকে শুরু করে বড় নদীগুলোও কচুরিপানায় ঢেকে থাকে এবং জলাশয়কে এই আগাছা মুক্ত করা খুব কঠিন।

(২) প্রতিবেশ-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য: বাংলাদেশে আমরা অনেকগুলো প্রতিবেশ-ব্যবস্থা দেখতে পাই। জীববৈচিত্র্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে মূলত চারটি প্রধান প্রতিবেশ-ব্যবস্থা চিহ্নিত করা যায়:

(ক) উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশ-ব্যবস্থা	উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন যা সারা বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ স্থান হিসাবে পরিচিত। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে নানা দ্বীপ ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে নারিকেল জিঞ্জিরা দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলবর্তী স্থানগুলোতে নানা ধরনের পাখি ও অতিথি পাখি সমবেত হয়।

(খ) স্বাদু বা মিঠাপানির প্রতিবেশ-ব্যবস্থা	বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে অজস্র নদী-নালা, খাল-বিল হাওর-বাওর জলাভূমি। এছাড়াও প্রতিবছরই দেশের একটি বৃহদাংশ বন্যায় প্লাবিত হয়। ফলে দেশের মূল ভূখণ্ডে স্বাদু বা মিঠাপানির নদীভিত্তিক প্রতিবেশ-ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। দেশের ভূভাগে রয়েছে অনেক অভ্যন্তরীণ জলাভূমি। দেশের জলাভূমির মোট আয়তন আনুমানিক ৭৫ লক্ষ হেক্টর। এসব জলাভূমি ও উত্তর-পূর্বে অবস্থিত হাওরগুলো জীববৈচিত্র্যের আধার।
(গ) উচ্চভূমি ও পার্বত্য বনাঞ্চলের প্রতিবেশ-ব্যবস্থা	উচ্চভূমি ও পার্বত্য বনাঞ্চলের প্রতিবেশ-ব্যবস্থার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি বনভূমি, বরেন্দ্র ভূমি, মধুপুরের উচু বনভূমি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পাহাড়ি প্রতিবেশ-ব্যবস্থাগুলোতে উদ্ভিদ ও লতা-গুল্মের বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। মধুপুরের প্রতিবেশ ব্যবস্থায় শাল গাছ ছাড়াও ১৭০ প্রজাতির পাখি ও ২৮ প্রজাতির সরীসৃপ আছে।
(ঘ) মানুষ পরিবর্তিত প্রতিবেশ-ব্যবস্থা	সময়ের সাথে মানুষ দ্বারা প্রকৃতির বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিবেশ-ব্যবস্থায় সর্বত্র একই ধরনের জীববৈচিত্র্য সবসময় দেখা যায় না। যেমন, পার্বত্য প্রতিবেশ-ব্যবস্থার মাঝে কাপ্তাই হ্রদ কৃত্রিমভাবে নির্মিত। ফলে কাপ্তাই হ্রদের জীববৈচিত্র্য অন্যান্য পাহাড়ি প্রতিবেশ-ব্যবস্থার অনুরূপ নয়।

(৩) বংশগতির বৈচিত্র্য: বাংলাদেশে গৃহপালিত পশু-পাখি এবং চাষকৃত ফসল বা উদ্ভিদ উভয় ক্ষেত্রেই বংশগতির বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কৃষি প্রতিবেশ-ব্যবস্থায় উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদের বংশগতিগত ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে কারণ শত শত বছরব্যাপী স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলো প্রজাতির বংশগতিগত ভিন্নতাকে সযত্নে সংরক্ষণ করেছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো চাষকৃত বা পালিত সকল ধরনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এগিয়ে আসছে। উদ্ভিদ ধান, তেলের বীজ, আলু, পাট এসব প্রজাতির অসংখ্য বংশগতিভিত্তিক বৈচিত্র্য রয়েছে। সবচাইতে বেশি বংশগতিভিত্তিক বৈচিত্র্য রয়েছে ধানের। বাংলাদেশে প্রায় ৬০০০ রকম ধানের সন্ধান পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির ক্ষেত্রে গবাদি পশুর বংশগতিগত বৈচিত্র্য সর্বাধিক। কুকুর, বিড়াল এবং পাহাড়ি এলাকায় শূকর প্রজাতির মধ্যেও বংশগতিগত বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	বাংলাদেশের জীব প্রজাতিগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?
কাজ- ২:	বাংলাদেশে কয় ধরনের প্রতিবেশ ব্যবস্থা দেখা যায়?

২০১৯

পাঠ- ০৬ ও ০৭ : বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য ক্ষতির স্থানীয় কারণসমূহ

বিশ্বজুড়ে জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখিন। মানুষের ধ্বংসাত্মক ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই কারণে জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে আর সেই সাথে বাড়ছে মানুষের ভোগ বিলাসের পরিমাণ। মানুষের ভোগ-বিলাসিতার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মানুষের খাদ্য এবং অন্যান্য চাহিদা মেটাতে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য। এভাবেই ক্রমবর্ধমান শোষণে বিপন্ন হচ্ছে পৃথিবী।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের প্রতি সাধারণ হুমকিসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলোর উৎপত্তি দুই ধরনের। **প্রথমত**–বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রভাবে সৃষ্ট হুমকিসমূহ যেমন, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন, মরুকরণ বা কৃষিজমি ধীরে ধীরে মরুভূমিতে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। এধরনের পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশেও জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। **দ্বিতীয়ত**–বাংলাদেশের মানুষের কাজকর্মের ফলে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উপরন্তু, এই ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের নীতিগত ও আইনগত ব্যবস্থাও বাংলাদেশে পর্যাপ্ত নয়। অপর পৃষ্ঠার সারণিতে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্থানীয় কারণসমূহ দেখানো হলো।

সারনি ৬.১: জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্থানীয় কারণসমূহ

স্থানীয় কারণসমূহ	উদাহরণ
ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১) বর্ধিত জনগণের জন্য বাসস্থান ও সম্পদের চাহিদা।
	২) স্থানীয় কৃষি সংস্কৃতির পরিবর্তে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদের প্রবর্তন।
	৩) ভূমির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন।
	৪) দরিদ্র জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি।
পরিবেশ দূষণ	১) সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার।
	২) যত্রতত্র কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নির্গমণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ।
ভূমির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাজনিত সংকট	১) জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক ভূমি ব্যবহার ও মালিকানার ধরন নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধতা।
	২) প্রচলিত আইন কাঠামো ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কিছু কিছু নীতি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ বিজ্ঞানের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।
	৩) ভূমি ব্যবস্থাপনায় লোকজ জ্ঞানের ব্যবহার কমে যাওয়া।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেতনতার অভাব	১) শাসক ও নীতি নির্ধারকদের আগ্রহের বিষয় হলো যে কোনোভাবে উন্নয়ন ঘটানো।
	২) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম হলো অর্থনৈতিক উন্নতির আপ্রাণ চেষ্টা।
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার সীমাবদ্ধতা	১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা।
	২) সংরক্ষিত এলাকা ও অভয়ারণ্যসমূহে যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব।
	৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা যতটা উৎপাদনমুখী ততটা সংরক্ষণবাদী নয়।

কোনো এলাকায় জীববৈচিত্র্য হারানোর হুমকিসমূহকে একটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র- ৬.৪ : একটি স্থানীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্য ক্ষতির বহুবিধ কারণ

অনুশীলন	
কাজ- ১:	বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির স্থানীয় কারণসমূহ বর্ণনা কর।
কাজ- ২:	তোমার এলাকায় পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে ফলে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হচ্ছে এমন কোনো ঘটনা বর্ণনা কর।

পাঠ-০৮: মানবজীবনে জীববৈচিত্র্যের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবনধারণের জন্য জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই প্রয়োজনীয়তা যদিওবা সবসময় অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য নয়, তথাপি মানব কল্যাণে ও সমৃদ্ধিতে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকেও আমরা জীববৈচিত্র্যের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারি, যথাঃ (১) জীববৈচিত্র্যের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা (২) জীববৈচিত্র্যের পরোক্ষ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা এবং (৩) অব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা।

সারনি ৬.২: জীববৈচিত্র্যের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা	উদাহরণ
(১) জীববৈচিত্র্যের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা	১) খাদ্য
	২) বাসস্থান নির্মাণ সামগ্রী
	৩) জ্বালানি
	৪) কাগজ ও কাগজের তৈরি সামগ্রী
	৫) সূতা, আঁশ ও বস্ত্র সামগ্রী
	৬) শিল্প ও কল-কারখানার কাঁচামাল
	৭) ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী
(২) জীববৈচিত্র্যের পরোক্ষ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা	১) বৈশ্বিক প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেমন, মানুষের অনুকূল বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু রক্ষা করা।
	২) বিভিন্ন উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে মাটি ঢেকে রাখা ও ক্ষয় রোধ করা।
	৩) পরিশোধনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানি সংরক্ষণ।
	৪) গাছপালার মাধ্যমে বায়ু পরিশোধন করে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সঞ্চালন বাড়ানো।
	৫) প্রকৃতির নিজস্ব পুষ্টিচক্র ও পরিশোধন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নিয়ন্ত্রণ।
	৬) পরাগায়ণ ও গাছপালার বীজ ছড়ানোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির বংশবৃদ্ধি ঘটানো।
	৭) কৃষির জন্য ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।
	৮) শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু।
	৯) পর্যটন ও বিনোদনের উৎস।
	১০) মানুষের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক চেতনার এবং অনুপ্রেরণার উৎস।
	১১) প্রকৃতি সম্পর্কে জানার তথ্যসূত্র প্রদান করে।
	১২) জিন বা বংশগতির প্রাকৃতিক লাইব্রেরি বা তথ্যসম্ভার হিসাবে কাজ করে।
	১৩) মানুষ, দল, গোষ্ঠী ও সমাজের দুর্যোগ সহনশীলতা ও খাপ-খাওয়ানোর সামর্থ্য।

(৩) জীববৈচিত্র্যের অব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা	১) ভবিষ্যৎ সুযোগ, সম্ভাবনা ও প্রত্যাশার উৎস হিসাবে গুরুত্ব।
	২) বৈচিত্র্যের উপস্থিতি ও অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার গুরুত্ব।
	৩) ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বর্তমানের জীববৈচিত্র্য রেখে যাওয়ার গুরুত্ব।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	জীববৈচিত্র্যের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তাগুলো কী কী?
কাজ- ২:	জীববৈচিত্র্যের পরোক্ষ প্রয়োজনীয়তাগুলো কী কী?

পাঠ -০৯: বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিবেশ-ব্যবস্থার সহায়তার উপরই মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। বাংলাদেশে কৃষক, মৎসজীবী, বনজীবী, হস্তশিল্পীসহ সকলেই জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে প্রকৃতি বা স্থানীয় প্রতিবেশ-ব্যবস্থা থেকে। সুতরাং বাংলাদেশে জীবিকার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপেই জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের কল্যাণের জন্যই পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে সযত্নে রক্ষা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের চরম উন্নতির এই যুগেও প্রকৃতির উদার সান্নিধ্য ও অনুদান ছাড়া মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবে না। জীবন রক্ষাকারী ঔষধপত্র থেকে শুরু করে জ্বালানি, বসতবাড়ি নির্মাণ পর্যন্ত জীবনধারণের উপকরণগুলোর অধিকাংশ এখনও প্রকৃতি থেকেই আসে। তাই প্রকৃতিকে ধ্বংস না করা এবং তার জীববৈচিত্র্যকে সযত্নে রক্ষা করা মানুষের দায়িত্ব। মানুষ প্রকৃতি কিংবা জীববৈচিত্র্যকে সৃষ্টি করেনি, সে নিজেই অন্য সব জীবের মতো প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের অংশ। অথচ মানুষই প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের বেশি ক্ষতি সাধন করছে। জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হলো:

- জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের জীবিকার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল।
- জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ মানুষকে খাদ্য, পানি, দূষণমুক্ত বায়ু, আলো, অক্সিজেন, জ্বালানি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উপকরণ সরবরাহ করে থাকে।
- পৃথিবীর উপরিভাগের এক চতুর্থাংশ ভূমি চাষাবাদের উপযোগী এবং খাদ্য শস্যের অন্যতম উৎস। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বাঁচলে এই বিশাল ভূমির উর্বরতা ও গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকবে।
- মানুষের পোষাক পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র এবং ঔষধ তৈরির অধিকাংশ উপকরণ এখনও প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করা হয়। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
- পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

- পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বাঁচলে কৃত্রিম সার এবং রাসায়নিক কীটনাশকের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমবে। ফলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জৈবসারসহ নানা প্রয়োজনীয় জৈব উপকরণ উৎপাদন সম্ভব হবে।
- প্রকৃতিতে এখনও লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও লতাগুল্ম রয়ে গেছে যাদের রাসায়নিক বা ঔষধি গুণাগুণ এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বাঁচলে এসব উদ্ভিদও টিকে থাকবে। ফলে মানব সমাজের স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এসব উদ্ভিদকে ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যাবে।
- পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য মানুষের বিনোদন, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য। বর্তমানে প্রকৃতি বান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সারা পৃথিবী জুড়ে বিনোদন ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
- সবশেষে, একটি সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর।
কাজ- ২:	জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তাসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে ক্রমানুসারে সাজাও।

পাঠ- ১০: পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

সমগ্র পৃথিবী জুড়েই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রকৃতির কাছাকাছি বসবাস করে। প্রকৃতির সাথে এদের জীবনধারা ও জীবিকার রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। হাজার বছর ধরে প্রকৃতির সাথে নিবিড় ও পরিপূরক সম্পর্ক রেখে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা সংরক্ষণ করেছে প্রকৃতিকে এবং রক্ষা করেছে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যসহ এই পৃথিবীকে রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীও এর ব্যতিক্রম নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো সরকারের বিভিন্ন বিভাগের নানা কার্যক্রমের পাশাপাশি নিজেদের সাধ্যমতো প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করে চলেছে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক নানা অস্থিরতার মাঝেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষার জন্য গ্রাম ভিত্তিক সামাজিক বনায়নের কাজ করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গ্রাম ভিত্তিক সামাজিক বন (Village Common Forest বা VCF) হলো জীববৈচিত্র্যকে রক্ষার সনাতনী পদ্ধতি। সমষ্টিগত মালিকানা এসব বনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা সম্প্রদায়ের সদস্যরা সামাজিক গ্রাম বন থেকে ভেষজ ঔষধপত্র, কাঠ, বাঁশ, বেতসহ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো এসব বন যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে আসছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের গ্রামগুলোর চারপাশে গ্রামবাসী মিলে বনায়ন করে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে থাকে। এই ধরনের বনকে গ্রাম ভিত্তিক সামাজিক বন বলা হয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত আইন দ্বারা এসব বন পরিচালিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনুকূল সরকারি নীতিমালার অভাবে এসব বনের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কয়টি গ্রাম ভিত্তিক সামাজিক বন টিকে আছে সেগুলোর মোট পরিমাণ আনুমানিক ২০২ হেক্টর।

পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামভিত্তিক সামাজিক বনগুলোতে গড়ে ১৭৩ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ৬০ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। এক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম ভিত্তিক সামাজিক বনগুলো পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

গ্রামভিত্তিক সামাজিক বন ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো তাদের প্রতিদিনের জীবনচর্চায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করছে। যেমন, জুমচাষের সময় তারা বিশেষ কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলে। নির্দিষ্ট কিছু গাছপালা, ঔষধি বৃক্ষ বা বন্যপ্রাণীকে ধ্বংস না করে তারা বরং এদেরকে বাঁচিয়ে রাখে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। বনজ সম্পদ আহরণের বেলায়ও তারা ঋতুভেদ মেনে চলে। কোন ঋতুতে কোন জিনিসটি আহরণ করা যাবে না এবং কোনটি করা যাবে, সে বিষয়ে কিছু প্রথাগত বিধিনিষেধ তাদেরকে মেনে চলতে হয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের জন্যই এসব রীতিনীতি প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইতঃমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকা রিজার্ভ ফরেস্ট বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেছে। সাধারণভাবে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এই তিন জেলায় বিভিন্ন শ্রেণির সম্মিলিত বনের পরিমাণ হলো ১০,৯৯,৫৮৪ হেক্টর। এর মধ্যে প্রায় ৩,৩৪১৬০ হেক্টর বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন রিজার্ভ ফরেস্ট বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল যা পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তনের এক চতুর্থাংশ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এই বনাঞ্চল রক্ষার জন্য সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। এছাড়া এই অঞ্চলে রয়েছে বন্যপ্রাণীর জন্য দু'টি অভয়ারণ্য। এর একটি রাঙামাটি জেলার কাসালং রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকার পাবলাখালিতে অবস্থিত। এই অভয়ারণ্যটি ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার আয়তন ৪২,০৬৭ হেক্টরের বেশি। অন্যটি হলো রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রামপাহাড়-সীতাপাহাড় জাতীয় উদ্যান। এটির আয়তন ৩,০২৬ হেক্টর। তবে প্রয়োজনীয় তদারকি ও ব্যবস্থাপনার অভাবে সরকারের এসব সংরক্ষিত বনভূমি এবং অভয়ারণ্য ক্রমে উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
কাজ- ২:	পার্বত্য চট্টগ্রামে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা কী?

পাঠ- ১১ ও ১২: সমতল অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বাংলাদেশে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদানও কম নয়। সরকারি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের উদ্যোগে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের নানা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

এদেশের বনে বসবাসরত অধিবাসীদের অধিকাংশই মূলত হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। হাওর, বাওর কিংবা অন্যান্য জলাভূমি অঞ্চলেও তাদের বসবাস রয়েছে। এসব অঞ্চলে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার মূল অবলম্বন হলো স্থানীয় প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমি থেকে আহরিত কাঠ, বাঁশ, মৎস্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব প্রাকৃতিক ভূমি বা বনাঞ্চল থেকে তারা যেমন সম্পদ আহরণ করে, তেমনিভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সেসব সম্পদ বা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নানা পদ্ধতিও ব্যবহার করে।

সামাজিক মালিকানার বন কিংবা অন্যান্য বন থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো নানা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করলেও তাদের প্রথাগত কিছু রীতিনীতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচরণ, সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের কাছে বন অত্যন্ত পবিত্র। সে কারণে নির্বিচারে বন ও প্রকৃতির সবকিছু আহরণ না করে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে সেগুলো সংগ্রহ করে । উদাহরণস্বরূপ, সুন্দরবনের আদি জনগোষ্ঠী মুণ্ডা, বাওয়ালি, মাওয়ালি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের প্রথাগত নিয়ম হলো কাঠ সংগ্রহের সময় ঘন বন থেকে শুধু বয়স্ক গাছ কাটা যাবে, কচি বা ছোট গাছ কাটা যাবে না। কিছু কিছু গাছ একেবারেই কাটা যাবে না, কারণ সেগুলো পবিত্র এবং কাটলে মহাপাপ ও সমূহ বিপদ ঘটতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে। তেমনিভাবে শিকার, মধু বা মৎস্য সংগ্রহের সময়ও অনুরূপ নিয়ম মেনে চলতে হয় যেমন, মৌমাছিকে না মেরে মধু সংগ্রহ করতে হবে এবং ছোট বড় সব মাছকে নির্বিচারে আহরণ করা যাবে না। শিকারের সময় গর্ভবতী হরিণ বা অন্যান্য প্রাণী, ডিমওয়ালা মাছ, পাখি প্রভৃতি হত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে এমন কিছু বন আছে, যেগুলোকে অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নিজেদের এসব প্রথা ও রীতিনীতি যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছে। এসব অঞ্চলের চাকমা, ত্রিপুরা, মান্দি, মণিপুরী, হাজং, বানাই, রাজবংশী, কোচ, হদি, ডালুসহ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সমাজে এমন কিছু প্রথা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিক বিধিনিষেধ, ঐতিহ্য, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আচরণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি চালু আছে যেগুলো সম্পূর্ণ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। যেমন– অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীকে তারা প্রথাগত নিয়ম মেনে সংরক্ষণ করে। কারণ সেগুলো না থাকলে গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে ঔষধপত্র তৈরি, কাপড়ের রং, সূতা ও আসবাবপত্র তৈরি, ধর্মীয় উপাসনা, পরিবেশের সৌন্দর্য বর্ধন, বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে বাড়িঘর রক্ষা, কিংবা নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ ও সান্নিধ্য লাভ করা যাবে না। বন ও প্রকৃতির এসব উপকরণের সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তারা নিজেদেরকে প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য মনে করে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে অবশ্যই যথাযথ গুরুত্বের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি কীভাবে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বর্ণনা কর।
কাজ- ২:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব মূল্যবোধ কীভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক? ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের ধরন কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২. জীববৈচিত্র্য রক্ষা করলে-

i. ভেষজ ঔষধ সহজলভ্য হবে

ii. চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটবে

iii. উদ্ভিদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

লিপি শিক্ষা সফরে একটি বনাঞ্চল পরিদর্শন করে। উক্ত বনাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা জোয়ারের সময় প্লাবিত হয়।

৩. লিপির দেখা বনটি হলো-

i. চির হরিৎ

ii. ম্যানগ্রোভ

iii. পত্র পতনশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. উক্ত বনাঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

ক. লবণাক্ত মাটিতে বনের সৃষ্টি খ. সারা বছর সবুজ থাকে

গ. উদ্ভিদ খুব দীর্ঘ হয় ঘ. এক জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. মায়া সহপাঠী কল্পনা চাকমার বাড়ি বান্দরবানে বেড়াতে যায়। কল্পনা মায়াকে একটি নির্দিষ্ট বন দেখিয়ে বলে, এ বনে চাষাবাদ নিষিদ্ধ। মায়া একটি ফল খেতে চাইলে কল্পনা তাকে বলে, গ্রাম্য প্রধানের অনুমতি ছাড়া এ বনের কিছু নেওয়া যায় না। তারা অন্য একটি বনে হাটার সময় লক্ষ করল মানুষ বন কেটে জুম চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে তারা কিছু গাছ কাটছে না।

ক. ম্যানগ্রোভ বন কাকে বলে?

খ. প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বলয় বলতে কী বোঝ?

গ. মায়ার দেখা প্রথম বনটির ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দুটি বনের কোনটি অধিকতর কার্যকর বলে মনে কর। মতামত দাও।

২.

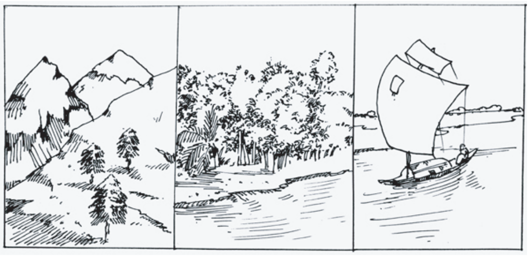

বরফ বনভূমি নদী

চিত্র-১ (প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য ভরা)

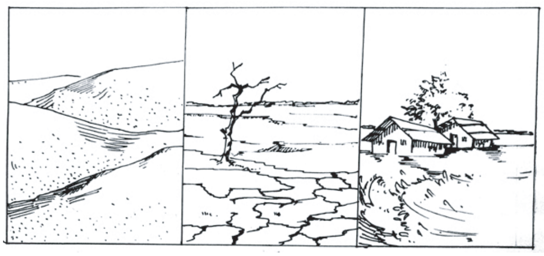

মরুকরণ বৃক্ষহীন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস

চিত্র-২ (জীববৈচিত্র্যহীন)

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

খ. প্রতিবেশ ব্যবস্থার বৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়?

গ. চিত্র-১ এ যে ধরনের জীববৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. চিত্র-২ সৃষ্টিতে মানুষের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

৭ম-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য